সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১
খিলাফতই হচ্ছে একমাত্র সমাধান	৪
খিলাফত কী?	৫
খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা ফরজ	৬
আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা)'র কিতাব থেকে প্রমাণ	৬
সুন্নাহ্ ভিত্তিক দলিল প্রমাণ	৭
ইজ্‌মা আস্-সাহাবা বা সাহাবা (রাঃ) দের ঐকমত্য	১০
শরিয়াহ্ মূলনীতি	১০
নতুন খলিফা নিয়োগের সময়সীমা ও এই দায়িত্ব পালন না করার পরিণতি	১২
খিলাফত হবে এককেন্দ্রিক	১৩
রাসূল (সাঃ) এর পথ অনুসরণ করে খিলাফত (ইসলামিক রাষ্ট্র) পুনঃপ্রতিষ্ঠা	১৪
যথাযথ ইসলামিক ব্যক্তিত্ব গঠনের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের জন্য উপযুক্ত দল গঠনের পর্যায়	১৫
দলবদ্ধভাবে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা	১৬
প্রকাশ্য ও ব্যাপক দাওয়াতের পর্যায়	১৭
আদর্শিক সংগ্রাম	২০
আপোসের প্রস্তাব	২১
ইসলাম বিরোধীদের জুলুম ও নির্যাতন	২২
ত্যাগ স্বীকার	২৩
নেতৃস্থানীয়দের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা পর্ব	২৫
জনমতের গুরুত্ব	২৬
ব্যাপক গণমানুষের সাথে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা	২৬
খিলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা খুব দূরে নয়	২৭
আল্লাহ্'র সাহায্য	২৮
হে বিশ্বাসীগণ, আল্লাহ্'র আহ্বানে সাড়া দিন	২৯

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

ভূমিকাঃ

দৈনিক 'দি টাইমস' এক সময় এক হিন্দু লেখককে উদ্ধৃত করে লিখেছিল,

> "তুরষ্ক এখন ইসলামের নেতৃত্বদানকারী বিশ্বশক্তি থেকে একটা গুরুত্বহীন দুর্বল বলকান রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।"

এটা ছিল ৭ মার্চ ১৯২৪ সাল, তার কিছু দিন পূর্বে বিশ্বাসঘাতক মুস্তফা কামালের হাতে খিলাফত ব্যবস্থার পতন হয়েছে মাত্র। এর ৮০ বছর পর বলকান রাষ্ট্রগুলো যেমন বসনিয়া ও কসোভোর জনগণ পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছে খিলাফতের ধ্বংসের পর কী ভয়ংঙ্কর বিপদ তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আমরা কিভাবে ভুলব সেখানকার গাছে গাছে ঝুলন্ত মুসলমানদের মৃতদেহ গুলোর কথা; আমাদের স্মৃতিতে দুঃস্বপ্ন হয়ে আছে হাজার হাজার মুসলমান মহিলার অপমানের কাহিনী; সেব্রেনিকার মাঠগুলোতে এখনও ছড়িয়ে আছে শত শত গণকবর। মানবতার বিরুদ্ধে এই জঘন্য অপরাধ সংঘঠিত হয়েছে বিশ্বাসঘাতক জাতিসংঘের নাকের ডগায়। স্থানীয় মুসলমানদেরকে প্রথমে শান্তির নামে ধোঁকাবাজি করে নিরস্ত্র করা হয়েছে এবং তারপর তাদের উপর বর্বর সার্বীয় খ্রিষ্টানদেরকে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন আমাদের প্রশ্ন করা প্রয়োজন কিভাবে এরকম জঘন্য ঘটনা ঘটল যখন সুলতান মুরাদের উত্তরসূরীরা আকাশ পথে মাত্র ১৫ মিনিটের দূরত্বে অবস্থান করছিল? তারা তো সেই সব মুসলমানদেরই উত্তরসূরী যারা ৬০০ বছর পূর্বে বলকান অঞ্চলকে ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে এসেছিল। আমরা কত অসহায় বোধকরি যখন আমাদের বিশাল সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে আবদ্ধ রেখে নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য শুধুমাত্র বিমানভর্তি কম্বল আর কুর'আনের কপি পাঠানো হয়।

গত একযুগ ধরে দেড়শ' কোটি মুসলমানের চোখের সামনে পশ্চিমাদের নির্মম অবরোধের শিকার হয়ে মারা গেছে সাত লক্ষ ইরাকী শিশু আর এখন সমস্ত ইরাক জুড়ে চলছে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর হামলা, খুন, দখল, শোষণ, লুটপাট আর ধ্বংসযজ্ঞ। 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের' নামে চলছে বিশ্বব্যাপী মুসলিম নিধন। ইহুদীবাদের মদদপুষ্ট সাম্রাজ্যবাদীদের সহযোগী হিসাবে কাজ করছে আরব বিশ্বের স্বৈরাচারী শাসকরা। একদিকে এক মার্কিন তেল কোম্পানীর কর্মকর্তার নেতৃত্বে আফগানিস্তানে চলছে তথাকথিত 'লয়া জিরগার' শাসন অন্যদিকে জনগণ প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে মার্কিন বোমারু বিমানের হামলা ও যুদ্ধবাজ মাফিয়া লর্ডদের জুলুম নির্যাতনে। এভাবে আর কতদিন? আজ বিশ্বের সর্বত্র মুসলমানরা বুঝতে পারছে যে কোথাও তারা নিরাপদ নয়– ইরাক, ফিলিস্তিন, বসনিয়া, চেচনিয়া, কসোভো, কাশ্মীর, আফগানিস্তান, সোমালিয়া, গুজরাট– এই তালিকা প্রতিদিন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে।

গত সত্তর বছর কিংবা তারও বেশী সময় ধরে মুসলমানরা এই হতাশার গভীরে নিমজ্জিত। ব্যর্থতা, বিভেদ, হানাহানি, রক্তপাত, ভীতি আর জুলুম হচ্ছে মুসলিম বিশ্বের বাস্তব চিত্র। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের দেশগুলোর কোনও প্রভাব নেই বললেই চলে। বরং আমাদের উপর শত্রুদের প্রভাব এতটাই প্রবল যে পরস্পরের জন্য আমাদের দেশগুলো কিছুই করতে পারছে না।

এই দুঃখজনক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের উচিত কিছু প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধান করা। তাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত আজকে কেন আমরা এই অর্থহীন রক্তপাতে লিপ্ত? আমাদের দেশগুলোতে রক্ত ঝরছে বছরের পর বছর ধরে। সাম্প্রতিক সময়ে আমরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করেছি লেবানন, চাদ, পশ্চিম সাহারা, ইয়েমেন, সোমালিয়া, ইরান, ইরাক আর আফগানিস্তানে। পাশাপাশি আমাদের উপর চলছে পৃথিবীর সবচেয়ে নির্দয় সরকারগুলোর শাসন। প্রতিবাদী জনগণকে বিনা বিচারে আটক রাখা, অত্যাচার করা কিংবা হত্যা করা তাদের কাছে কোনও বিষয়ই নয়। তারা সবসময় চেষ্টা করছে তাদের বিরোধীদেরকে দেশে এবং দেশের বাইরে সম্পূর্ণ নির্মূল করতে।

আমাদের প্রশ্ন করা উচিত আমাদের দুর্বলতা ও বিভেদ সর্ম্পকে। কেন এত তেল ও টাকার অধিকারী হয়েও আজকের আরব বিশ্ব ইসরায়েলের উপর কোন চাপ সৃষ্টি করতে পারছেনা? কেন দেড়শ' কোটি মুসলমান মাত্র পঁয়ত্রিশ লাখ ইহুদী অধ্যুষিত ইসরায়েলকে পরাজিত করতে পারছেনা? কেন ১৫ বছরে ১.৫ ট্রিলিয়ন অতিরিক্ত তেল রাজস্ব পেয়েও একটা আরব দেশও সাম্প্রতিক সময়ে উঠে আসা কোরিয়া কিংবা সিংগাপুরের মত শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হতে পারল না? কেন বিভিন্ন মুসলিম দেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরস্পরের সহযোগী এবং পরিপূরক শক্তি হিসাবে কাজ করতে পারছে না? সৌদী আরবের টাকা আর সুদানের জনশক্তি ও কৃষিসম্পদ মিলে বিশাল কৃষিশিল্প গড়ে উঠতে পারে; উপসাগরীয় দেশগুলোর অর্থ আর মিশরের দক্ষ জনশক্তির সমন্বয়ে বড় মাপের উৎপাদনশীল শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব; কিন্তু এই সরকারগুলো তা করছে না। কেন? ধর্ম, ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে এত মিল থাকার পরও কেন আমাদের মধ্যে এত বিভেদ-অনৈক্য?

একসময়ের পরাশক্তি মুসলিম জাতি আজকে কেন এত দুর্বল? আমাদের দুর্বলতা তো কোনও উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বিষয় নয় আর অবশ্যই ইসলামও এ দুর্বলতার উৎস নয়। বস্তুত আমরা দুর্বল কেননা আমরা ইসলামকে পরিত্যাগ করেছি। যদিওবা আমরা মুসলমান কিন্তু যে সমাজ ও পরিবেশে আমরা বাস করি সেটা ইসলামিক নয়। আজকের মুসলিম সমাজ ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করেনা। আমাদের বর্তমান সমাজের চিন্তা, মূল্যবোধ, চেতনা, আইন-কানুন সবই অনৈসলামিক উৎস থেকে উৎসারিত। আমাদের সমাজের প্রতিশ্রুতি ও আনুগত্য ইসলামের প্রতি নয়, জাহেলিয়াতের প্রতি।

তাওহীদ হচ্ছে আমাদের প্রেরণা আর সকল ক্ষমতার উৎস হচ্ছেন আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা)– এই আক্বিদার বিপরীতে আজকের সমাজে প্রতিষ্ঠিত আছে পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, ব্যক্তিস্বার্থ, মুনাফা আর আত্মগৌরবের বাতিল আক্বিদা। তাই আমাদের হৃদয়ে আর ইসলামিক মূল্যবোধ প্রবেশ করে না। আমাদের অন্তর সত্যিকার ইসলামিক চেতনায় আলোকিত নয়। আমাদের আক্বিদা আর জীবন পদ্ধতির মধ্যে চলছে সুস্পষ্ট দ্বন্দ্ব।

১৯২৪ সালে যখন মোস্তফা কামাল আনুষ্ঠানিকভাবে খিলাফত পদ্ধতির অবসান ঘোষণা করে তখনই মুসলমানদের জীবন ব্যবস্থায় শরিয়াহ্ শাসনের পুরোপুরি অবসান ঘটে। মুসলমানরা পশ্চিমা নিয়ম-পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং জীবন থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এক আল্লাহ্'র উপাসনা বাদ দিয়ে মানব রচিত নিয়ম-পদ্ধতি ও আইন-কানুনের উপাসনা শুরু হয়। আর এটাই হচ্ছে আমাদের সকল দুর্বলতা ও দুর্গতির মূল।

খিলাফতের শাসন শেষ হয়ে যাওয়ার পর মুসলিম অধ্যুষিত ভূমিসমুহ ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তি, প্রধানত বৃটেন ও ফ্রান্সের দখলদারিত্বের শিকার হয়। এই দুটো দেশ মুসলিম ভূমিগুলোর অর্থনীতি, শাসন, শিক্ষা এবং রাজনীতিতে সরাসরি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কায়েম করতে শুরু করে। ক্রমান্বয়ে আমাদের দেশগুলো সম্পূর্ণভাবে এই ধর্মনিরপেক্ষ নিয়ম-পদ্ধতির অধীনে চলে যায়। ঔপনিবেশিক শাসনামলে পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত ও পশ্চিমা চিন্তা-চেতনায় গড়ে ওঠা অনেক লোক রাষ্ট্রের উচ্চপদগুলোতে অধিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্র, সমাজ ও গণমাধ্যমের উচ্চপদে আসীন এসব লোকের প্রভাবকে ব্যবহার করে মুসলমান সমাজকে পশ্চিমা ধাঁচে গড়ে তোলার প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পুরনো ধাঁচের উপনিবেশবাদ সমস্যার সম্মুখীন হয়। যুদ্ধের কারণে ইউরোপীয় শক্তিগুলোর অর্থনীতিতে ধস নামে এবং ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যাপক প্রচারণা ও জাতিসংঘের চাপের মুখে ইউরোপীয়রা তাদের উপনিবেশগুলোতে সরাসরি উপস্থিতি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। এক সময় মুসলিম দেশগুলো আপাত দৃষ্টিতে স্বাধীনতা লাভ করে।

পুরনো সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে পশ্চিমা মন-মানসিকতায় গড়ে ওঠা নব্য ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিদের কাছে এই নতুন রাষ্ট্রগুলোর শাসনভার ছেড়ে দেয়া হয়। আর এরা এদের পূর্বতন সাম্রাজ্যবাদী প্রভূদের পদাংক অনুসরণ করতে থাকে। নবগঠিত এসব রাষ্ট্রের উন্নয়ন এবং পুনর্জাগরণের জন্য ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনেতারা ইসলাম ছাড়া অন্যান্য সকল পদ্ধতিই ব্যবহার করে। কিন্তু ফল হয় বিপরীত। রাজনীতির নামে চলে শুধু মাত্র দুর্নীতি এবং অত্যাচার; শাসকগণ জনগণের মধ্যে শুধু মাত্র বিভক্তি আর দুর্দশাই বাড়াতে সক্ষম হয়। অপমানজনকভাবে মুসলিম দেশগুলো ক্রমান্বয়ে তাদের শত্রুদের উপর আরো বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়তে থাকে। সংক্ষেপে বলা যায় বস্তুবাদী চিন্তার ধারকরা আমাদের জনগণকে যে মিথ্যা স্বপ্ন দেখিয়েছিল ধর্মনিরপেক্ষ পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর মাধ্যমে সেগুলো তো অর্জন করতে পারেইনি বরং মুসলমানদেরকে পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শক্তির দাসত্বের শৃঙ্খলে আরো বেশি করে আবদ্ধ করে ফেলেছে।

দেশে দেশে মানুষ যখন মুসলিম জনপদগুলোকে ইউরোপীয়দের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল তখন ইসলাম ছিল তাদের মূল প্রেরণাশক্তি। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর যে সব সৎ মুসলমান জীবন বাজী রেখে এসব সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদেরকে পশ্চিমাদের মদদপুষ্ট ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেয় এবং নিজেদের কুফর চিন্তা-চেতনা দ্বারা জনগণকে শাসন করতে শুরু করে। তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, মিসর ও পাকিস্তান সবগুলো দেশেই ইসলামী আবেগকে দূরে

ঠেলে দিয়ে পশ্চিমাদের রেখে যাওয়া আইন-কানুন দিয়েই রাষ্ট্র পরিচালনার কাজ শুরু হয়। কিন্তু এতকিছুর পরও ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা মুসলিম বিশ্বের কোথাও তাদের সংগ্রাম থামিয়ে দেয়নি। ধর্মনিরপেক্ষ জীবনব্যবস্থার ব্যর্থতাকে তুলে ধরে তারা সর্বত্রই ইসলামী জীবনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির এই বিরূপ পরিবেশেও এর বিরুদ্ধে তাদের লড়াই অব্যাহত আছে এবং মুসলিম উম্মাহ্'র বিরুদ্ধে কাফেরদের ষড়যন্ত্রের মুখোশ খুলে দেয়ার জন্য তারা আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

যখন দেশে দেশে মানব রচিত জীবনব্যবস্থার স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে গেছে তখন জনগণ স্বাভাবিকভাবেই এই জুলুম, দুর্নীতি, পরনির্ভরতা, অপমান, অসহায়ত্ব ও বিভক্তির একমাত্র সমাধান হিসাবে ইসলামকেই দেখতে পাচ্ছে। তাই গত দুই তিন দশক ধরে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিভাবে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র জনগণ ইসলামে ফিরে আসার জন্য জেগে উঠেছে।

আজ আরববিশ্ব, আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা, ইরান, ইরাক, কুর্দিস্তান, তুরস্ক, আলজেরিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ– সর্বত্র জনগণ তাদের মধ্যে বিদ্যমান কুফর জীবনব্যবস্থা ও জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনাকে ঝেড়ে ফেলে নিজেদের মৌলিক বিশ্বাসকে বুঝতে শুরু করেছে এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদেরকে নিয়োজিত করছে। তাদের দৃঢ় ঈমানী চেতনা ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি তীব্র আকাঙ্খা অনেক স্বৈরশাসকের ভিত কাঁপিয়ে দিচ্ছে এবং পশ্চিমাদের অনেক হিসেব নিকেশ উল্টে যাচ্ছে। ইসলামের এই পুনর্জাগরণ মুসলমান জনগণের ঘরে ঘরে এই বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে যে, পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য আবারও ইসলাম ফিরে আসছে। এই মুহূর্তে মুসলমানদের করণীয় হচ্ছে এই সংগ্রামে পরিপূর্ণ আন্তরিকতা ও প্রজ্ঞার সাথে অংশগ্রহণ করা। এ কাজের পূর্বশর্ত হিসেবে আমাদেরকে অবশ্যই বিশ্বমুসলিম তথা মানবতার সমস্যাকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে; কুফরের সাথে ইসলামের সংগ্রামের প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করতে হবে এবং ইসলাম যে মানুষের সমস্যার পরিপূর্ণ ও সঠিক সমাধান দেয় এ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

খিলাফতই হচ্ছে একমাত্র সমাধান

মহান আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা) চান যে মানুষ একমাত্রই তাঁরই ইবাদত (দাসত্ব/আনুগত্য) করবে। এর অর্থ হচ্ছে মানুষ তার নিজের ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ, আইন ও বিচার ব্যবস্থা কুর'আন এবং রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ্'র মাধ্যমে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা)'র থেকে গ্রহণ করবে। মানুষের উপর কর্তৃত্ব করার জন্য অন্য কোনও কর্তৃপক্ষকে গ্রহণ করার মানে হচ্ছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্– আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনও ইলাহ্ নেই" এই সাক্ষ্যকে উপেক্ষা ও অস্বীকার করা। ইসলাম মুসলমানদেরকে শুধুমাত্র বিশ্বাসই (ঈমান) নয় বরং তার সাথে সাথে জীবনের সব সমস্যার সমাধানের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিও বলে দিয়েছে। জীবনের সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে ইসলামিক সমাধান প্রয়োগ করা ও মেনে চলাই হচ্ছে মুসলমানদের জন্য ইবাদত। যখন মুসলমানরা ঐশী আইন (আহ্কামে শরিয়াহ্) তাদের জীবনে প্রয়োগ করেছিল এবং তাদের জীবনের সব বিষয় ইসলাম অনুযায়ী পরিচালনা করেছিল আর ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অধীনে ছিল তখন আমরা মুসলমানরা ছিলাম পৃথিবীর

ইতিহাসে সবচেয়ে শক্তিশালী জাতি ও উন্নততর সমাজ– যা মানবজাতি এর আগে কিংবা পরে কখনো প্রত্যক্ষ করেনি।

যখন থেকে আমরা ইসলামকে অনুসরণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন করা শুরু করেছি ঠিক তখন থেকেই রাষ্ট্র ও জাতি হিসাবে আমাদের অধঃপতনের শুরু। যখন আমরা ইসলাম ও এর জীবনব্যবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে পরিত্যাগ করলাম তখন আমাদের অধঃপতন সম্পূর্ণ হল– বিশ্ববাসীর সামনে আমাদের চরম অপমান ও অক্ষমতা প্রকাশিত হতে শুরু করল। শুধুমাত্র ইসলামে প্রত্যাবর্তন করে– তথা এই জীবনাদর্শের বিশ্বাস, ব্যবস্থাসমূহ ও আইনকে আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করেই আমাদের পুনর্জাগরণ সম্ভব। যখন এ দুটো পরস্পর নির্ভরশীল উপাদান (বিশ্বাস ও ব্যবস্থা) এক সাথে সাবলিলভাবে উম্মাহ্'র জীবনে বাস্তবায়িত হবে তখনই মুসলমানরা আবারও উন্নতি আর অগ্রগতি অর্জন করবে। আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা)'র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে আমরা আবার আমাদের সত্যিকার অবস্থান তথা মানবজাতির নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হব। কিন্তু যতক্ষণ আমরা অনৈসলামিক আইন-কানুন ও জীবনব্যবস্থা আঁকড়ে ধরে থাকব ততক্ষণ পর্যন্ত গভীর হতাশার অন্ধকার থেকে আমাদের মুক্তি নেই; এ সময় আমরা এমন জাতিসমূহের দ্বারা শোষিত ও প্রতারিত হতে থাকব যারা এক সময় আমাদের সমকক্ষ হওয়ারও স্বপ্ন দেখত না, আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হওয়া তো দূরের কথা।

বর্তমানে অনৈসলামিক ব্যবস্থার সরকারগুলো অত্যাচার ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আমাদেরকে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা)'র পছন্দকৃত ও একমাত্র মনোনীত জীবনব্যবস্থা পালন করা থেকে বিরত রাখছে। তাই আমাদের সমাজে যদি ইসলামী জীবনব্যবস্থা চালু করতে হয় তাহলে অবশ্যই বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থাগুলোকে অপসারণ করে একটা ইসলামি সরকারব্যবস্থা তথা খিলাফত রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা শুধুমাত্র একটা বাস্তব প্রয়োজনীয়তাই নয় বরং একটা ধর্মীয় কর্তব্যও (ফরজ) বটে।

খিলাফত কী?

যে রাষ্ট্রব্যবস্থা আহ্কামে শরিয়াহ্'র প্রয়োগ ও ইসলাম প্রচারের জন্য দায়িত্বশীল তাই হচ্ছে খিলাফত। ইসলামি শাসনব্যবস্থাকেই খিলাফত নামে অভিহিত করা হয় এবং এটা অন্য সব শাসনব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শুধুমাত্র আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা)'র কিতাব ও রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ্'র উপর পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত খিলাফত ব্যবস্থা একটা অনন্য ব্যবস্থা। যদিও কেউ কেউ এই ব্যবস্থাটাকে ইমামত নামে সংজ্ঞায়িত করেন; মূল শাসন ব্যবস্থা একই। রাসুল (সাঃ) এর অনেক সহীহ্ হাদীস এই ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করে। যে নামেই এই ব্যবস্থা সংজ্ঞায়িত হোক না কেন এসব হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে ইসলামের দাবী হচ্ছে মুসলমানরা সর্বাবস্থায় ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করবে। খিলাফত হচ্ছে সারাবিশ্বের মুসলমানদের নেতৃত্ব, যা শরিয়াহ্ বাস্তবায়ন করে ও ইসলামের আহ্বান পৃথিবীর সব মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। ইমামত বলতেও একই ব্যবস্থাকে বোঝায়।

খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা ফরজ

সারাবিশ্বের মুসলমানদের উপর খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা একটা অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা)'র আদেশকৃত অন্যান্য ফরজ কাজের মত খিলাফত প্রতিষ্ঠার ফরজ কাজটাও অবশ্যই আমাদেরকে পালন করতে হবে। এ ব্যাপারে কোনও পছন্দ-অপছন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছার সুযোগ নেই। এই দায়িত্বের প্রতি উদাসীন থাকা কিংবা একে উপেক্ষা করা একটা কবীরা গুনাহ্ যার জন্য আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা) কঠিন শাস্তি দেবেন। এই বিষয়টা আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা)'র কিতাব, রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ্ ও সাহাবা (রাঃ) দের ইজ্মা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা)'র কিতাব থেকে প্রমাণ

আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা) রাসূল (সাঃ) কে মুসলমানদের পারস্পরিক বিষয়সমূহ তিনি যা নাজিল করেছেন সে অনুযায়ী সম্পন্ন করতে বলেছেন; অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা) তাঁকে (সাঃ) এই আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা) রাসূল (সাঃ) কে বলেন,

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

"অতএব, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিগকে আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদানুযায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ আসিয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিবেন না।" [সূরা আল-মায়িদাহ্: ৪৮]

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْ

"আর আমি আদেশ দিতেছি যে, আপনি ইহাদের পারস্পরিক ব্যাপারে এই প্রেরিত কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করিবেন এবং তাহাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করিবেন না এবং তাহাদিগ হইতে অর্থাৎ এ বিষয়ে সতর্ক থাকিবেন যেন তাহারা আপনাকে আল্লাহ্ প্রেরিত কোনও নির্দেশ হইতে বিভ্রান্ত করিতে না পারে।" [সূরা আল-মায়িদাহ্: ৪৯]

রাসূল (সাঃ) এর প্রতি আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা)'র আদেশ তাঁর (সাঃ) উম্মাহ্'র প্রতিও সমভাবে প্রযোজ্য যতক্ষণ না সেখানে কোনও স্পষ্ট প্রমাণ থাকে যে উক্ত উক্তি শুধু তাঁর (সাঃ) প্রতি সীমাবদ্ধ। এক্ষেত্রে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা)'র উপরোক্ত উক্তিগুলোতে এমন প্রমাণ নেই যে এগুলো শুধু রাসূল (সাঃ) এর প্রতি সীমাবদ্ধ। এভাবে উক্ত আয়াতগুলোতে মুসলমানদেরকে আল্লাহ্'র আইন বাস্তবায়নের আদেশ দেয়া হয়েছে। আর একজন খলিফার নিয়োগ আসলে আল্লাহ্'র আইন ও ইসলামিক ক্ষমতার বাস্তবায়নকেই বোঝায়। আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা) মুসলমানদেরকে ক্ষমতার বাহক শাসকদেরকে মেনে চলতেও বাধ্য করেছেন আর শাসককে মেনে চলার জন্য শাসকের (খলিফা) বর্তমান থাকা আবশ্যক।

আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা) বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ

"হে ঈমানদারগণ; আল্লাহ্'র নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বশীল তাদের ; অনন্তর যদি তোমরা কোনও বিষয়ে পরস্পর দ্বিমত হও, তবে ঐ বিষয়কে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর ছাড়িয়া দাও, যদি তোমরা আল্লাহ্র প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখ।" [সূরা আল-নিসা: ৫৯]

যে বাস্তবে অস্তিত্বশীল নয় আল্লাহ্ তার আনুগত্যের আদেশ দেন না। সুতরাং একজন শাসকের বর্তমান থাকা বাধ্যতামূলক এবং যারা ক্ষমতায় আছে তাদের আদেশ মানার আদেশ সেই ক্ষমতাশীলদের প্রতিষ্ঠা করার আদেশেরই নামান্তর। শরিয়াহ্ আইনের বাস্ত বায়ন একজন ক্ষমতাশীলের উপস্থিতির উপর নির্ভরশীল এবং সেই শাসকের অনুপস্থিতির ফলস্বরূপ শরিয়াহ্ আইন অবাস্তবায়িত থাকে। যেহেতু একজন শাসকের অনুপস্থিতি শরিয়াহ্ আইনকে অবাস্তবায়িত রাখে (যা গুনাহ্) সুতরাং সেই শাসকের উপস্থিতি একটা ফরজ বিষয়।

সুন্নাহ্ ভিত্তিক দলিল-প্রমাণ

من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له،

ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর (রাঃ) বলেছেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে বলতে শুনেছি, 'যে আনুগত্যের শপথ (বা'য়াত) থেকে তার হাত ফিরিয়ে নেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার সাথে এমনভাবে সাক্ষাত করবেন যে– ঐ ব্যক্তির পক্ষে কোনও দলিল থাকবে না, এবং যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে যে তার কাঁধে কোনও আনুগত্যের শপথ নেই তবে তার মৃত্যু হচ্ছে জাহেলী যুগের মৃত্যু।' " [মুসলিম]

এভাবে রাসূল (সাঃ) প্রত্যেক মুসলমানের উপর আনুগত্যের শপথ (বা'য়াত) থাকাকে ফরজ বলে নির্দেশ করে গিয়েছেন। যে বা'য়াত (আনুগত্যের শপথ) ছাড়া মৃত্যু বরণ করে তিনি (সাঃ) তার মৃত্যুকে ইসলামপূর্ব অজ্ঞানতার (জাহেলিয়াতের) যুগের মৃত্যু হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আর এটাও স্পষ্ট যে আনুগত্যের শপথ দেওয়ার জন্য একজন খলিফা (ইমাম) থাকা জরুরী।

যদিও রাসূল (সাঃ) উল্লেখ করেননি যে প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই খলিফার হাতে আনুগত্যের শপথ করা একটা ফরজ কাজ তথাপি তিনি (সাঃ) সব মুসলমানের কাঁধের উপর আনুগত্যের শপথ থাকাকে অবশ্য কর্তব্য করে দিয়েছেন। অন্য কথায় প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক

মুসলমানের উপর একটা আনুগত্যের শপথ (বা'য়াত) থাকা ফরজ। এটা মুসলমানদের মধ্যে এমন একজন খলিফা থাকাকে অবশ্য প্রয়োজনীয় করে তোলে যার কাছে আনুগত্যের শপথ করা যায়। সমভাবে খলিফার উপস্থিতিই প্রত্যেক মুসলমানের কাঁধের উপর আনুগত্যের শপথকে (বা'য়াত) সম্ভব করে ।

হিশাম বিন উরওয়া আবি সালেহ্ থেকে, আবি সালেহ্ আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, *"রাসূল (সাঃ) বলেছেন,*

سيليكم بعدي ولاة فيليكم البر ببره , ويليكم الفاجر بفجوره , فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق , فإن أحسنوا فلكم ولهم , وإن أساءوا فلكم وعليهم

'আমার পরে যে নেতারা ক্ষমতা গ্রহণ করবে তাদের ভেতর ধর্মপরায়নরা তোমাদেরকে তাদের ধার্মিকতা দিয়ে পরিচালিত করবে এবং অধার্মিকরা তাদের অধার্মিকতা দিয়ে। অতএব তাদের কথা শোনো ও তাদেরকে মান্য কর এমন সব ক্ষেত্রে যেখানে তারা সত্যের অনুগামী হয়। যদি তারা সঠিকভাবে কাজ করে তবে তা তোমাদের পক্ষে যাবে, এবং যদি তারা ভুলভাবে কাজ করে তবে তা তোমাদের পক্ষে ও তাদের বিরুদ্ধে হিসাব করা হবে।' "
[আল-মাওয়ার্দি]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে আল-আরাজ ও সেই সূত্রে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, *"রাসূল (সাঃ) বলেছেন,*

إنما الإمام جُنة يُقاتَل من ورائه ويُتّقى به

'নিশ্চয়ই, ইমাম হচ্ছেন ঢাল স্বরূপ যার পেছনে থেকে জনগণ যুদ্ধ করে এবং যার মাধ্যমে জনগণ নিজেদেরকে রক্ষা করে।' " [মুসলিম]

আবু হাজিমের বরাত দিয়ে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, *"আমি আবু হুরায়রার সাথে পাঁচ বছর অতিবাহিত করেছি এবং তাকে বলতে শুনেছি, রাসূল (সাঃ) বলেছেন,*

وروى مسلم عن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وأنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم

'বনী ইসরাঈলকে শাসন করতেন নবীগণ। যখন এক নবী মৃত্যুবরণ করতেন তখন তার স্থলে অন্য নবী আসতেন, কিন্তু আমার পর আর কোনও নবী নেই। শীঘ্রই অনেক সংখ্যক খলিফা আসবেন। তাঁরা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন তখন আপনি আমাদের কী করতে আদেশ করেন? তিনি (সাঃ) বললেন, তোমরা একজনের পর একজনের বা'য়াত পূর্ণ করবে, তাদের হক আদায় করবে। অবশ্যই আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা) তাদেরকে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন করবেন।' " [বুখারী ও মুসলিম]

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, *"রাসূল (সাঃ) বলেছেন,*

من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه ، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية

'যদি কেউ তার আমিরের মধ্যে এমন কিছু দেখে যা তার পছন্দ নয় সে যেন ধৈর্যধারণ করে। সাবধান! এজন্য যদি কেউ নিজেকে সুলতান (ইসলামিক নেতৃত্ব) থেকে এক বিঘাত পরিমানও আলাদা করে নেয় অতঃপর সে অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে তবে তার মৃত্যু হবে জাহেলীয়াতে।' " [বুখারী ও মুসলিম]

এসব হাদীসে রাসূল (সাঃ) আমাদের জানিয়েছেন যে ইমাম বা খলিফারা (নেতারা) আমাদের রাজনীতি কায়েম রাখবেন এবং সেই সাথে ইমাম বা খলিফাকে বর্ণনা করেছেন মুসলমানদের ঢাল হিসাবে যিনি মুসলমানদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। ইমামকে ঢালের সাথে তুলনা করা একজন ইমামের উপস্থিতির তীব্র প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে– তাই মুসলমানদের উপর একজন ইমাম থাকা একটা দৃঢ় আদেশ। এটা এজন্য যে যখন আল্লাহ্ ও তার রাসূল (সাঃ) আমাদেরকে এমন কিছু সম্পর্কে বলেন যার সাথে তিরস্কার উল্লেখিত হয় তবে সেটা একটা বিরত থাকার আদেশ হিসাবে গৃহীত হয়। অন্য কথায় সেই বিষয় থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয় । বিপরীত ভাবে কুর'আনের কোনও আয়াত বা রাসূলের (সাঃ) কোনও হাদীসে যদি কোনও বিষয়ের প্রশংসা উল্লেখিত হয় তবে সে কাজটা আসলে করতে বলা হয়। যদি কোনও একটা ওয়াজিব পালন করার জন্য অন্য কোনও কিছু অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে তবে সেটাও ওয়াজিব এবং যদি এমন হয় যে কোনও কিছুর অনুপস্থিতিতে শরিয়তের কোনও আদেশ পালন অসম্ভব হয়ে পড়ে তাহলে তা বর্তমান থাকা ওয়াজিব।

এসব হাদীসের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে যারা মুসলমানদেরকে দেখাশোনা করবেন তারা হচ্ছেন খলিফা সুতরাং খলিফা নিয়োগ করা একটা ফরজ কাজ। হাদীস থেকে আমরা আরো জানছি যে ইসলামিক নেতৃত্ব (শাসনকর্তৃত্ব) থেকে মুসলমানদের আলাদা হওয়া নিষেধ (হারাম) এবং তাই এর সাথে থাকার প্রয়োজনেই ইসলামিক নেতৃত্ব (শাসনকর্তৃত্ব) স্থাপন করা মুসলমানদের উপর ফরজ। তাছাড়া রাসূল (সাঃ) মুসলমানদেরকে খলিফার আদেশ মানার নির্দেশ দিয়েছেন এবং যে বা যারা খলিফার সাথে ক্ষমতা নিয়ে বিরোধ করবে তাদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন, যা বস্তুতপক্ষে একজন খলিফা নিয়োগ ও তার খিলাফতকে এমনকি যুদ্ধের মাধ্যমে হলেও রক্ষা করারই একটা আদেশ।

আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন আল আস (রাঃ) হতে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, *"রাসূল (সাঃ) বলেন,*

« ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر »

'যখন একজন ইমামের হাতে বা'য়াত গ্রহণ সম্পূর্ণ হয়ে যায় তখন তাকে যথাসাধ্য মান্য করবে, এমতাবস্থায় যদি কেউ তার সাথে বিরোধ করতে আসে (বা'য়াত দাবী করে) তবে দ্বিতীয় জনকে হত্যা করবে।' " [মুসলিম]

অতএব, ইমামের আনুগত্যের আদেশ প্রকৃত পক্ষে একজন ইমাম নিয়োগেরই আদেশ এবং যারা তার সাথে বিরোধ করবে তাদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ থেকেও এটা প্রমাণিত হয় যে একজন মাত্র খলিফা বর্তমান থাকাটা একান্তই আবশ্যক।

ইজ্‌মা আস্‌-সাহাবা বা সাহাবা (রাঃ) দের ঐকমত্য

রাসূল (সাঃ) এর মৃত্যুর পর তাঁর সাহাবীরা (রাঃ) তাঁর (সাঃ) একজন উত্তরাধিকারী (খলিফা) নিয়োগের প্রয়োজনীয়তার উপর ঐকমত্যে পৌঁছেছিলেন। তারা সবাই আবু বকর (রাঃ) কে তার (সাঃ) উত্তরাধিকারী এবং আবু বকর (রাঃ) এর মৃত্যুর পরে ওমর (রাঃ) এবং এভাবে ওসমান ও আলী (রাঃ) কে খলিফা নিয়োগ করেছিলেন। একজন খলিফা নিয়োগের ব্যাপারে সাহাবা (রাঃ) দের ঐকমত্য রাসূল (সাঃ) এর মৃত্যুর পরপরই খুব জোরালোভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। তখন সাহাবা (রাঃ) গণ রাসূল (সাঃ) এর দাফন কার্যকে বিলম্বিত করে তাঁর (সাঃ) প্রতিনিধিত্বকারী একজন খলিফা নিয়োগের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছিলেন। এটা সবারই জানা ছিল যে কোনও ব্যক্তির দাফন একটা ফরজ কাজ এবং যারা এটা করবে তারা দাফন কার্যের পূর্বে তারচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজে নিজেদেরকে নিযুক্ত করবে– এটা হারাম। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে রাসূল (সাঃ) এর কিছু সাহাবা (রাঃ) নিজেদেরকে একজন খলিফা নিয়োগের ব্যাপারে ব্যস্ত রেখেছিলেন– যদিও রাসূল (সাঃ) এর দাফন কার্যও তাদের উপর ফরজ ছিল। অন্যান্য সাহাবারা (রাঃ) এ ব্যাপারে নীরব ছিলেন এবং রাসূল (সাঃ) এর দাফন কার্য বিলম্বিত করার বিপরীতে প্রতিবাদ করার সামর্থ্য থাকা সত্বেও তারা রাসূলের (সাঃ) মৃতদেহ দাফনের ব্যাপারে দু'রাত বিলম্ব করার ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছিলেন।

মৃতকে দাফনের চেয়েও একজন খলিফার নিয়োগ অধিক গুরুত্বপূর্ণ– উপরোক্ত ঘটনার মাধ্যমে সাহাবারা এ ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছিলেন। কেননা এরূপ করা কখনো বৈধ হতনা যদিনা মৃতদেহ দাফনের ফরজের চেয়ে খলিফা নিয়োগ আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হত। সাহাবারা (রাঃ) তাদের সারা জীবন খলিফা নিয়োগ যে ফরজ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছিলেন। যদিও কখনো কখনো কাকে খলিফা নিয়োগ করতে হবে এ ব্যাপারে তাঁরা মতপার্থক্য করেছিলেন, কিন্তু একজন খলিফা যে নিয়োগ করতে হবে এ ব্যাপারে তাঁদের ছিল পূর্ণ ঐকমত্য। খলিফা নিয়োগের ব্যাপারে সাহাবাদের ঐকমত্য (ইজ্‌মা আস্‌-সাহাবা) একটা সুস্পষ্ট ও দৃঢ় প্রমাণ যে খলিফা নিয়োগ করা ফরজ।

শরিয়াহ্‌ মূলনীতি

এটা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত যে আমাদের জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও শরিয়াহ্ আইনের বাস্তবায়ন করা ফরজ। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না একজন শাসক থাকছেন অথবা তার হাতে ক্ষমতা না থাকছে ততক্ষণ আমাদের জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও শরিয়াহ্ আইন বাস্ত বায়ন করা সম্ভব নয়।

আর শরিয়াহ্'র মূলনীতি হচ্ছে:

إن ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب

"ওয়াজিব পালনের জন্য যা প্রয়োজন তা নিজেই ওয়াজিব।"

এক্ষেত্রে এই শরিয়াহ্ মূলনীতি অনুযায়ী একজন খলিফার উপস্থিতি ওয়াজিব।

বিভিন্ন দলিল-প্রমাণ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে মুসলমানদের উপর শরিয়াহ্ আইন ও ক্ষমতা বাস্তবায়ন এবং একজন খলিফা থাকা– যিনি আইন প্রয়োগের ও শরিয়াহ্ বাস্তবায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, একটা অবশ্য কর্তব্য। উপরন্তু শুধুমাত্র আইন প্রয়োগ ও ক্ষমতার খাতিরেই নয় বরং অভিভাবক ও নেতা হিসেবেও উম্মাহ্'র একজন খলিফা থাকাটা ফরজ। এটা নিম্নোক্ত হাদিসের মাধ্যমে জানা যায়।

আউফ বিন মালিক আল আশ'আবী বলেন যে, "*রাসূল (সাঃ) বলেছেন,*

« خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلّون عليهم ، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم . قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف ، فقال : لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يداً من طاعة »

'তোমাদের ইমামদের (নেতা) মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে তারা যারা তোমাদেরকে ভালবাসে এবং তোমরা তাদেরকে ভালবাস, এবং যারা তোমাদের জন্য প্রার্থনা করে এবং তোমরা যাদের জন্য প্রার্থনা কর; এবং তোমাদের ইমামদের (নেতা) মধ্যে নিকৃষ্ট হচ্ছে তারা যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর আর তারা তোমাদেরকে ঘৃণা করে ও তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দাও আর তারা তোমাদেরকে অভিশাপ করে।' আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ' ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাঃ) আমরা কি তখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করব না?' তিনি বললেন, ' না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের ভেতর সালাত (ইবাদত) প্রতিষ্ঠা করে ।' " [মুসলিম]

এই হাদীস স্পষ্ট ভাবে আমাদেরকে ভাল ও খারাপ নেতাদের সর্ম্পকে জানায় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ইবাদত প্রতিষ্ঠিত রাখে ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা থেকে বিরত থাকার আদেশ করে।

'ইবাদত প্রতিষ্ঠা' মানে হচ্ছে ইসলামকে উচ্চে তুলে ধরা ও শরিয়াহ্ বাস্তবায়ন করা।

ইসলামিক আইনের উৎস সমূহের মধ্যে মুসলমানদের উপর একজন খলিফা নিয়োগের দায়িত্ব– যিনি ইসলামের আইন বাস্তবায়ন করবেন এবং ইসলামের আহ্বানকে (দাওয়াত) সারা বিশ্বের কাছে পৌঁছে দেবেন– এমন গুরুত্বের সাথে বর্ণিত হয়েছে যে এটা সন্দেহাতীত ভাবে একটা ফরজ দায়িত্ব । অবশ্য এটা একটা সম্মিলিত দায়িত্ব (ফরজে কিফায়া) । যদি কিছু লোক এই কার্য সমাধা করে তবে সবার পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে এবং অবশিষ্ট উম্মাহ্ দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু উম্মাহ্'র একাংশ যদি এই দায়িত্ব পালনের জন্য কাজ করেও তা সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয়, তবে পুরো মুসলিম জাতির উপর এই দায়িত্ব পালন করার দায় থেকে যায় । মুসলমানরা যতদিন খলিফা (ইসলামিক শাসক) ছাড়া থাকবে ততদিন মুসলিম উম্মাহ্'র কেউই এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবে না।

নতুন খলিফা নিয়োগের সময়সীমা ও এই দায়িত্ব পালন না করার পরিণতি

মুসলমানদের পক্ষে খলিফার প্রতি আনুগত্যের শপথ (বা'য়াত) ব্যতীত দুই রাতের অধিক অবস্থান করা নিষেধ (হারাম)। এটা সাহাবাদের ঐকমত্য দ্বারা নির্ধারিত।

রাসূল (সাঃ) এর মৃত্যু সংবাদ শোনামাত্রই সাহাবারা (রাঃ) বনু সাইদার প্রাঙ্গনে রাসূলুল্লাহ্'র (সাঃ) একজন উত্তরাধিকারী নির্ধারণের ব্যাপারে মিলিত হলেন, তখন পর্যন্ত রাসূল (সাঃ) কে দাফন করা হয়নি। রাসূল (সাঃ) এর ওফাতের পর থেকে পরপর দুই দিন পর্যন্ত সাহাবারা (রাঃ) এই ব্যাপারে আলোচনা করলেন। তারপর তারা আবু বকর (রাঃ) কে বা'য়াত দেওয়ার জন্য মসজিদ উন-নবীতে মিলিত হলেন। যখন বা'য়াত দেওয়া সম্পন্ন হল তাঁরা (রাঃ) রাসূল (সাঃ) এর দাফন সমাধা করলেন; রাসূল (সাঃ) এর মৃত্যুর তিন দিন (দুই রাত) পর তাঁর (সাঃ) দাফন সম্পন্ন হল । এভাবে রাসূলের (সাঃ) সাহাবারা (রাঃ) একজন উত্তরাধিকারী নির্ধারণের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর (সাঃ) দাফন কার্যকে বিলম্বিত করলেন।

যখন উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) মৃত্যুর কাছাকাছি ছিলেন তখন তিনি পরবর্তী খলিফা হিসাবে সাহাবাদের (রাঃ) মধ্যে ছয় জনের নাম উল্লেখ করেছিলেন। রাসূল (সাঃ) তাঁর মৃত্যুর সময় যাদেরকে উম্মাহ্'র নেতৃত্বের ব্যাপারে যোগ্য বলে রায় দিয়েছিলেন উমর (রাঃ) তাঁদের (রাঃ) নামই এ ক্ষেত্রে প্রস্তাব করেছিলেন। এই ছয়জনের ভেতর উসমান (রাঃ) , আলী বিন আবু তালিব (রাঃ), আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) ও ছিলেন। উমর (রাঃ) তখন আদেশ জারি করেছিলেন যে, তিন দিনের ভেতর খলিফা বাছাই'র ক্ষেত্রে যদি মতৈক্যে পৌঁছানো না যায় তবে যে মতভেদ করতে থাকবে তার শিরশ্ছেদ করতে হবে। যদিও যথাযথ কারণ ছাড়া যে কোনও হত্যাকান্ড হারাম– উমরের (রাঃ) এই আদেশের বিরোধিতা সাহাবারা (রাঃ) কেউ করেননি এবং এই ছয়জন যেনতেন ব্যক্তি ছিলেন না, তারা ছিলেন রাসূল (সাঃ) এর শ্রেষ্ঠ সাহাবাদের (রাঃ) ছয়জন– যাঁরা পৃথিবীতে থাকতেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন। সাহাবাদের এই ঐকমত্য আমাদের জন্য একটা ইসলামিক দলিল যে মুসলমানদের পক্ষে তিন দিনের বেশী খলিফা ছাড়া অবস্থান করা হারাম। মদীনার জনসাধারণের সাথে তিন দিনের আলোচনা ও পরামর্শের পর উসমান (রাঃ) কে খলিফা

নির্বাচিত করা হল। পূর্ববর্তী খলিফার মৃত্যু অথবা তার ক্ষমতা ত্যাগের সময় থেকে তিন দিনের (দুই রাত) মধ্যে মুসলমানদের জন্য পরবর্তী খলিফা নির্ধারণ করা ফরজ। যদি খলিফার নিয়োগ দুই রাতের বেশী বিলম্বিত হয় তাহলে বিষয়টা অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিতে হবে এবং তার পিছনের কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। যদি মুসলমানরা পারিপার্শ্বিক বিরূপ পরিবেশ অথবা এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজে অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকার কারণে তা করতে ব্যর্থ হয়ে থাকে তাহলে তারা এই বিলম্বের দায় থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু কোনরূপ অবহেলা বা উদাসিনতার কারণে যদি খলিফা নিয়োগ না করা হয় তবে মুসলমানরা অবশ্যই অপরাধী হবে ।

খলিফা নিয়োগ থেকে বিরত থাকা একটা বড় গুনাহ্, কারণ এটা ইসলামের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ও বড় দায়িত্ব। শরিয়াহ্ বাস্তবায়ন এবং দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামে ইসলাম উপস্থিত থাকা না থাকা এই দায়িত্ব পালনের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং যদি মুসলমানরা তাদের ভেতর থেকে একজন খলিফা নির্বাচন থেকে বিরত থাকে তবে সামগ্রিকভাবে পুরো মুসলিম জাতি খুব বড় গুনাহ্'র কাজ করে। যদি তারা এই দায়িত্ব পালন না করার সিদ্ধান্ত নেয় তবে পৃথিবীর প্রত্যেক প্রান্তের প্রতিটা মুসলমানের উপর এই দায়িত্ব পালন না করার পাপ আরোপিত হবে। যদি মুসলমানদের কোনও দল এই দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করে এবং অন্যরা তা থেকে বিরত থাকে তবে যারা সচেষ্ট থাকে তারা ব্যতীত অন্যান্যদের উপর এই পাপ আরোপিত হবে। এটা এজন্য যে আল্লাহ্ তাদেরকে এমন একটা দায়িত্ব দিয়েছিলেন যা তারা পালন করেনি কিংবা পালনের চেষ্টাও করেনি। এভাবে তারা এই পৃথিবীর জীবনে ও পরকালে কঠিন শাস্তি ও লজ্জার ভাগী হবে। যারা এরকম করে তারা একদিকে খিলাফত প্রতিষ্ঠা থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখে এবং সেই সাথে পরোক্ষভাবে শরিয়াহ্ নির্ধারিত সেইসব কাজ থেকেও বিরত থাকে যেগুলোর বাস্তবায়ন খিলাফত থাকার উপর নির্ভরশীল। আর এটা বলাবাহুল্য যে খিলাফতই পৃথিবীতে আল্লাহ্'র আইন প্রতিষ্ঠিত রাখে ও আল্লাহ্'র বাণীকে সর্বোচ্চ প্রশংসিত স্থানে তুলে ধরে এবং ইসলামকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে। এ ধরনের একটা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য থেকে বিরত থাকা অবশ্যই শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

খিলাফত হবে এককেন্দ্রিক

মুসলমানরা একাধিক খলিফার অধীনে থাকতে পারে না; নিম্নোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা এটা নিশ্চিত করা হয়েছে।

আবু সাইদ আল খুদরী বর্ণনা করেন, *"রাসূল (সাঃ) বলেছেন,*

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما

'যদি দুইজন খলিফার জন্য আনুগত্যের শপথ (বা'য়াত) নেয়া হয় তবে পরের জনকে হত্যা কর।' " [মুসলিম]

আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন আল আস (রাঃ) হতে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, *"রাসূল (সাঃ) বলেন,*

« ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر »

'যখন একজন ইমামের হাতে বা'য়াত গ্রহণ সম্পূর্ণ হয়ে যায় তখন তাকে যথাসাধ্য মান্য করবে এমতাবস্থায় যদি কেউ তার সাথে বিরোধ করতে আসে (বা'য়াত দাবী করে) তবে দ্বিতীয় জনকে হত্যা করবে।' " [মুসলিম]

আরফাজার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, *"রাসূল (সাঃ) বলেন,*

من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه

'যখন কারও অধীনে তোমাদের বিষয় সমূহের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এমতাবস্থায় যদি কেউ তোমাদের বিভক্ত করতে আসে তবে তাকে হত্যা করবে।' "
[মুসলিম]

অতএব, খলিফা যখন দায়িত্ব গ্রহণ করবেন তখন তার কাজ হবে শরিয়াহ্'র সীমার মধ্যে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালানো যাতে করে সমস্ত মুসলমান পুনরায় তার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়।

রাসূল (সাঃ) এর পথ অনুসরণ করে খিলাফত (ইসলামিক রাষ্ট্র) পুনঃপ্রতিষ্ঠা

খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই রাসূল (সাঃ) কে পথপ্রদর্শনের দিশারী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে; কারণ এ কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে তাঁকে (সাঃ) অনুসরণের আদেশ নামাজ, রোজা, হজ্ব ইত্যাদি আরো অন্যান্য ধর্মীয় কর্তব্যের ক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণের আদেশের মতই অভিন্ন।

আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা) বলেন,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى*إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى

"তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কিছু বলেন না। এই কুর'আন ওহী, যা প্রত্যাদেশ হয়।"

[সূরা আন-নজম: ৩-৪]

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

"যে রাসূলের হুকুম মান্য করবে সে আল্লাহ্'রই হুকুম মান্য করল।"

[সূরা আন-নিসা: ৮০]

রাসূল (সাঃ) মদীনায় প্রথম ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা)'র কাছ থেকে সরাসরি দিক নির্দেশনা পেয়েছিলেন তাই তাঁর পদ্ধতিই হচ্ছে ইসলামিক রাষ্ট্র (খিলাফত) প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আল্লাহ্'র দেয়া পদ্ধতি । আল-কুর'আনে ইরশাদ হচ্ছে,

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

"বলঃ এটাই আমার পথ। আমি আল্লাহ্'র দিকে স্বজ্ঞানে মানুষকে আহ্বান করি এবং আমার অনুসারীরাও।" [সূরা ইউসুফ: ১০৮]

আমরা যদি ওহী নাযিলের সূচনা থেকে মদীনায় ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত রাসূল (সাঃ) এর সীরাতকে মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করি তাহলে দেখব যে রাসূল (সাঃ) জাহেল সমাজকে পরিবর্তন করে ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজে কতগুলো সুস্পষ্ট পর্যায় অতিক্রম করেছিলেন।

যথাযথ ইসলামিক ব্যক্তিত্ব গঠনের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের জন্য উপযুক্ত দল গঠনের পর্যায়

নিম্নোক্ত আয়াতগুলো নাযিলের মাধ্যমে মুহাম্মদ (সাঃ) এর নবুয়্যতের সূচনা হয়েছিল:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ*خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ*اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ*
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ*عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

"পাঠ করুন আপনার পালন কর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষকে জমাট রক্ত হইতে। পাঠ করুন আর আপনার পালনকর্তা মহাদয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়াছেন। মানুষকে শিক্ষা দিয়াছেন সেই সমস্ত বিষয় যাহা সে জানিত না ।"

[সূরা আলাকঃ ১-৫]

প্রথমে রাসূল (সাঃ) এই বাণীগুলো তাঁর (সাঃ) পরিবারের সদস্যবৃন্দ ও তাঁর (সাঃ) সারা জীবনের সাথী আবু বকর (রাঃ) এর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে বিবি খাদিজা (রাঃ) ও আবু বকর (রাঃ) এর সহযোগীতায় মক্কার বিভিন্ন মানুষের কাছে তিনি এই আহ্বান পৌঁছে দিতে শুরু করেন। তিনি (সাঃ) তাদের কাছেই প্রথমে যান যাদেরকে তিনি আগে থেকে চিনতেন এবং যাদের ব্যাপারে তিনি ছিলেন আশাবাদী। এভাবে ধীরে ধীরে সমস্ত মক্কা নগরীতে তাঁর (সাঃ) দাওয়াত সুপরিচিত হয়ে ওঠে।

প্রাথমিক পর্যায়ে– যা ছিল তিন বছর স্থায়ী; ব্যক্তিগত ভাবে মক্কার অধিবাসীদের কাছে ইসলাম নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং এই সময় মক্কার মুশরিক সম্প্রদায় ও তাদের জীবন পদ্ধতির সাথে সরাসরি কোনও দ্বন্দ্ব হয়নি।

এ পর্যায়ে কুর'আনের নির্দেশনা অনুযায়ী ইসলামের অনুসারীদের স্বভাব, অনুভূতি ও আচরণ গঠন করার প্রতি মনোযোগ দেয়া হয়েছিল। রাসূল (সাঃ) মুসলমানদের এমন একটা দল তৈরীতে মনোযোগী হয়েছিলেন যাঁরা সমাজের সাথে ভবিষ্যৎ প্রকাশ্য দ্বন্দ্বের যে কোনও পরিণতি ভোগ করার জন্য প্রস্তুত থাকবে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে যখন নবুয়্যত দেওয়া হয়েছিল তখন সমাজ অনৈসলামিক বিশ্বাস, মূল্যবোধ, অনুভূতি এবং আইন-কানুন নিয়ে সম্পূর্ণভাবে জাহেল অবস্থায় ছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূল (সাঃ) সে সমাজ থেকে উঠে আসা তাঁর (সাঃ) অনুসারীদেরকে ইসলামের চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস-মূল্যবোধ ইত্যাদি অত্যন্ত গভীর ভাবে বুঝিয়ে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা)'র উপর তাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করলেন। মূলত এই সময়টা তাদের (রাঃ) জাহেল ধারণা, প্রথা ও মূল্যবোধকে আল্লাহ্'র একত্ব তথা তাওহীদ দিয়ে পরিবর্তনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। রাসূল (সাঃ) আরকাম (রাঃ) এর গৃহে তাদেরকে একত্রিত করে কুর'আনের দেয়া ছাঁচে তাদের চরিত্রকে গঠন করতেন।

আজ আমাদেরকে জাহেলিয়াত ঠিক একইভাবে ঘিরে রেখেছে। যদিও ব্যক্তিগতভাবে আমরা মুসলমান, কিন্তু আমাদের সমাজ আজ সেই সময়ের মতই জাহেল, অনৈসলামিক। তাই ইসলামী রাষ্ট্র (খিলাফত) প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে আমাদেরকেও একটা ইসলামিক দল গঠন ও দলের সদস্যদের ভিতর ইসলামিক মতবাদ সুসংহত করার একটা প্রস্তুতি পর্বের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এই পর্যায়টা ইসলামিক মতাদর্শের গভীর ও যুগপোযোগী অধ্যয়ন ও অনুশীলনের জন্য নির্ধারিত যা এই মতাদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তিদেরকে ইসলামিক জীবন পদ্ধতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য যে জ্ঞান, ধৈর্য্য, সহনশীলতা ও জুলুম নির্যাতন সহ্যের মানসিকতা প্রয়োজন তার ভিত্তিতে গড়ে তুলবে। জাতির মধ্যে ইসলাম ও এর বিভিন্ন নিয়ম পদ্ধতি সর্ম্পকে ব্যাপক আলোচনা ও দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলাম সর্ম্পকে দৃঢ় আস্থা সৃষ্টির জন্য গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন। স্পষ্ট ও দৃঢ় মতাদর্শিক বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে একটা সুসংগঠিত দল গঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এর সদস্যরা যেন অপোসহীনভাবে শুধুমাত্র ইসলামের দিকে সমাজকে আহ্বান করে।

দলবদ্ধভাবে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা

শুধুমাত্র কয়েকজন ব্যক্তি একা একা বিচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করে খিলাফত রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার মত বিশাল কাজ করতে পারবে না। এটা একটা দলবদ্ধ কাজ যার জন্য একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে মুসলমানদেরকে দলবদ্ধ ভাবে কাজ করতে হবে। রাসূল (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীরা আলাদা আলাদা ব্যক্তি হিসাবে কাজ করেননি। রাসূল (সাঃ) এর সাহাবা (রাঃ) রা আরকাম (রাঃ) এর গৃহে একত্রিত হতেন, সেখানে তারা ইসলাম সর্ম্পকে শিখতেন, একসাথে ইবাদত করতেন এবং তাদের প্রত্যেকটা কাজ একটা দল হিসাবে করতেন।

সাহাবাদের (রাঃ) দলবদ্ধভাবে কাজ করার বাস্তব দৃষ্টান্ত অনেক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সাহাবারা (রাঃ) একদিন একসাথে ছিলেন এমতবস্থায় তারা বললেন যে কুরাইশরা রাসূল (সাঃ) ছাড়া অন্য কারো কাছে থেকে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে কুর'আন শোনেনি। আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) বললেন তিনি তাদেরকে কুর'আন শোনাবেন। পরদিন সকালবেলা তিনি কা'বা ঘরে গিয়ে উচ্চস্বরে কুর'আন তেলাওয়াত শুরু করলেন যেন মুশরিক কুরাইশরা তা

শুনতে পায়। তার তিলাওয়াত শুনে কুরাইশরা এসে তাকে আঘাত করতে শুরু করল। যখন তিনি সাহাবাদের (রাঃ) কাছে ফিরে এলেন তখন তারা বললেন; আমরা এমনটা হওয়ার ভয়ই করছিলাম। তিনি বললেন, "আল্লাহ্'র শত্রুরা আমার দৃষ্টিতে এখন যতটা ঘৃণার এমন আর কখনোই ছিলনা তোমরা যদি চাও আমি আগামীকাল তাদের সামনে আবার যাব এবং ঠিক একই কাজ করব।" সাহাবারা বললেন, "না, তুমি যথেষ্ট করেছ। তুমি তাদেরকে এমন জিনিস শুনিয়েছ যা তারা শুনতে চায় না।"

আবিসিনিয়ার রাজা যখন মুসলমানদের ডেকে ইসলামের দৃষ্টিতে যিশুর [ঈসা (আঃ)] অবস্থান সম্পর্কে কুরাইশদের অভিযোগের জবাব দিতে বললেন, তখন এমন আরেকটা ঘটনা ঘটেছিল। যখন মুসলমানদের কাছে রাজার সামনে হাজির হওয়ার আদেশ পৌঁছাল তখন ব্যাপারটা আলোচনা করার জন্য তারা (রাঃ) নিজেদের ভেতর একটা সভা করলেন। তারা কুর'আনে এ সম্পর্কে যা উল্লেখিত হয়েছে তা কোনও বিচ্যুতি ছাড়াই বলার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তাদের পক্ষ থেকে বলার জন্য জাফর বিন আবু তালিবকে (রাঃ) নির্বাচিত করলেন। মুসলমানদের বক্তব্য শোনার পর রাজা বললেন,"শান্তিতে বসবাস কর এবং যেই তোমাদেরকে অপমান করবে তার শাস্তি হবে। শান্তিতে বসবাস কর যেখানে ইচ্ছা, আমার ভূমিতে তোমরা নিরাপদ।"

প্রকাশ্য ও ব্যাপক দাওয়াতের পর্যায়

নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল হওয়ার মাধ্যমে দল গঠনের পর্যায় থেকে ব্যাপক ও প্রকাশ্য গণসংযোগের পর্যায়ে যাওয়ার জন্য রাসূল (সাঃ) কে নির্দেশ দেয়া হয়।

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ*إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ

"অতএব, আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।" [সূরা আল-হিজর: ৯৪-৯৬]

দাওয়াতের এই পর্যায়ে রাসূল (সাঃ) কুরাইশদের মধ্যে বিদ্যমান জাহেল সমাজ ব্যবস্থার প্রকাশ্য বিরোধিতা শুরু করলেন। তিনি কুরাইশদের কাছ থেকে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা) ছাড়া আর কোনও ইলাহ্'র ইবাদত না করার স্বীকৃতি চাইলেন। তিনি (সাঃ) ইসলামকে জনগণের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসার জন্য কতগুলো সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ নিলেন। প্রথমত তিনি (সাঃ) কুরাইশদের ভেতর নেতৃস্থানীয় কয়েকজনকে [যারা ছিল প্রধানত তাঁরই (সাঃ) আত্মীয়] নিজের বাড়ীতে একটি ভোজসভায় দাওয়াত করলেন। তিনি তাদের কাছে তাওহীদ ব্যাখ্যা করলেন এবং তাদের জন্য এমন জান্নাতের প্রতিজ্ঞা করলেন যা আসমান ও দুনিয়ার চেয়ে প্রশস্ত আর এমন আগুনের ভয় দেখালেন যে সম্পর্কে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা) বলছেন,

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ

"যে দিন আমি জাহান্নামকে বলিব যে, তুমি কি পরিপূর্ণ হইয়াছ? এবং সে বলিবে আরও আছে কী?" [সূরা ক্বাফ: ৩০]

অপর একদিন রাসূল (সাঃ) মক্কার সাফা পাহাড়ে উঠে সব কুরাইশ গোত্রের প্রতি সম্বোধন করে বললেন,

"أرأيتكم إن أخبرتكم أنّ العدو مصبحكم وممسيكم، ما كنتم تصدقونني؟". قالوا: "بلى". قال: "فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد"

"হে লোক সকল ! তোমরা আমাকে বল যদি আমি বলি পাহাড়ের পেছন থেকে শত্রুরা তোমাদের আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত– তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে?" তারা বলল "অবশ্যই, আমরা তোমার কাছ থেকে কখনও সত্য ব্যতীত অন্য কোনও কিছু পাইনি।" তখন তিনি (সাঃ) বললেন, "আমি তোমাদেরকে এক ভয়াবহ আযাব সম্পর্কে সতর্ক করছি।" [বুখারী]

তৃতীয় বড় ঘটনাটা ঘটে যখন হযরত হামজা ও ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল (সাঃ) মুসলমানদের দুটি সারি তৈরী করে একটাকে হযরত হামযা (রাঃ) ও অন্যটাকে হযরত ওমর (রাঃ) এর নেতৃত্বে প্রকাশ্যে কা'বার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করালেন। এ ঘটনা কুরাইশদেরকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। প্রথম বারের মত তারা ইসলামের দৃঢ় ভিত্তির বাস্তবতার মুখোমুখি হল। এই ঘটনার পূর্বে মুসলমানরা গোপনে তাদের ইবাদতগুলো সম্পন্ন করতেন এর পর থেকে তাঁরা প্রকাশ্যে কা'বা প্রাঙ্গনে ইবাদত করা শুরু করেন।

এসব ঘটনার মাধ্যমে রাসূল (সাঃ) ও মুসলমানদের দাওয়াতের প্রকাশ্যপর্ব তথা সরাসরি কুফর সমাজ ব্যবস্থাকে বিরোধিতা করার পর্যায় শুরু হয়।

এই পর্যায়ে রাসূল (সাঃ) মুসলমানদেরকে একটা সুসংগঠিত দল হিসাবে উপস্থাপন করলেন যারা প্রচলিত মূল্যবোধ, চিন্তা-চেতনা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, আচার-অনুশীলন, আবেগ-অনুভূতি, শাসন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ সমস্ত সমাজ কাঠামোকে বদলে দেওয়ার ব্যাপারে ছিলেন পুরোপুরি যোগ্যতাসম্পন্ন ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

সমাজকে পরিবর্তনের জন্য তাঁরা আপোসহীনভাবে জাহেল সমাজের মুখোমুখি হলেন। তারা আল্লাহ্ যে সত্য নাযিল করেছেন তা দ্বারা মিথ্যাকে দুরীভূত করার বিরামহীন সংগ্রাম শুরু করলেন।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় রাসূল (সাঃ) জাহেল সমাজের অভিজাততন্ত্র ও ধন সম্পদ কেন্দ্রিক মূল্যবোধগুলোকে আঘাত করলেন কুর'আনের এই বানী দ্বারা–

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ*الَّذِي جَمَعَ مَالا وَعَدَّدَهُ*يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ*كَلا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ

“প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর প্রতি দুর্ভোগ; যে অর্থ সঞ্চিত করে ও বারবার গণনা করে। সে মনে করে তাহার অর্থ তাহাকে অমর করিয়া রাখিবে। কখনোই নয়, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হইবে হুতামায়।” [সূরা হুমাযাহ: ১-৪]

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ*حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ*كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ

“প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে গাফেল করিয়া রাখে, এমনকি তোমরা কবরে পৌঁছিয়া যাও, এটা কখনও সঙ্গত নয়, তোমরা সত্বরই জানিতে পারিবে।”

[সূরা আত্-তাকাসুর: ১-৩]

সমাজের অভাবী ও বঞ্চিত শ্রেণীর প্রতি কুরাইশ নেতাদের দ্বিমুখী নীতি ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের মোকাবেলায় আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা) নাযিল করলেন,

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ*فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ*وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

“আপনি কি সেই লোকটাকে দেখিয়াছেন, যে প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করে; সে তো ঐ ব্যক্তি, যে এতীমকে গলা ধাক্কা দেয় এবং মিসকীনকে অন্ন দিতে উৎসাহিত করে না।”
[সূরা মাউন: ১-৩]

কুর'আন নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে তাদের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক চর্চাকে নিন্দা করল:

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ*الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ*وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

“যারা মাপে কম দেয় তাদের জন্য দুর্ভোগ; তারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয় তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয় এবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয় তখন কম করে।”
[সূরা মুতাফ্ফিফীন: ১-৩]

তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার ধারক ও নিয়ন্ত্রণকারী কুরাইশ নেতৃত্বকে নিন্দা করে আল্লাহ্ নাজিল করলেন,

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ*مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ*سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ* وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ* فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ

“ধ্বংস হউক আবু লাহাবের হস্তদয় এবং সে নিজেও। কোনও কাজে আসে নাই তাহার ধন সম্পদ যাহা সে উপার্জন করিয়াছে । সত্বরই সে প্রবেশ করিবে লেলিহান অগ্নিতে এবং তার স্ত্রীও, যে ইন্ধন বহন করে, গলায় খেজুরের রশি নিয়া।” [সূরা লাহাব: ১-৫]

তখনকার আরব সমাজের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আল-ওয়ালিদ বিন আল মুগীরা সর্ম্পকে আল্লাহ্ বললেন,

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ * وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ * وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ * هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ * مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ * عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ * أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ * إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ * سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ

"সুতরাং আপনি অবিশ্বাসীদের কথা মানিবেন না। তাহারা এই কামনা করে, যদি আপনি শিথিল হন, তবে তাহারাও শিথিল হইবে। আর আপনি এমন ব্যক্তির কথা মানিবেন না, যে অধিক শপথকারী, হীন প্রকৃতির, যে অপবাদকারী, চোগলখুরী করে, সৎকার্যে বাধা দেয়, সীমালঙ্ঘনকারী, পাপী, রুক্ষস্বভাবসম্পন্ন, তদুপরি অবৈধজাতও হয়, এই কারণে যে, সে সম্পদ ও সন্তানাদির অধিকারী; যখন আমার আয়াতসমূহ তাহার সম্মুখে পড়া হয় তখন বলে, ইহা ভিত্তিহীন কথা, যাহা পূর্বপুরুষগণ হইতে চলিয়া আসিতেছে। আমি অচিরেই তাহার নাসিকাপরে দাগ দিয়া দিব।" [সূরা কলম: ৮-১৬]

কুরাইশদের সাথে এই মতাদর্শিক সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে রাসূল (সাঃ) তৎকালীন জাহেল সমাজের সবগুলো রূপ কে উন্মোচন করতে লাগলেন এবং সেগুলোর প্রকাশ্য বিরোধিতায় অবতীর্ণ হলেন। ফলশ্রুতিতে কুরাইশদের সাথে তাঁর সম্পর্ক শত্রুতায় পর্যবসিত হল । তারা সবসময় তাঁর (সাঃ) সমালোচনা করত এবং তাঁর (সাঃ) বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াত। তারা রাসূল (সাঃ) এর চাচা আবু তালিবের কাছে অভিযোগ করল, "আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের পূর্বপুরুষদের বদনাম করছে, আমাদের প্রথা সমূহকে উপহাস করছে, আমাদের দেবতাদেরকে অপমান করছে– আমরা কিছুতেই এগুলো সহ্য করব না।"

আদর্শিক সংগ্রাম

ব্যাপক জনসংযোগের পর্যায়ে ইসলামিক মতাদর্শের ধারক দলকে অবশ্যই অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা নিতে হবে। যেমনভাবে রাসূল (সাঃ) ও সাহাবা (রাঃ) কাজ করেছিলেন সেরকম ধৈর্য্য ও সাহসের সাথে সমাজে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে দলকে মনোযোগী হতে হবে। সে সময় সাহাবা (রাঃ) দের অন্তরে ইসলামের উপর যে গভীর আস্থা তৈরী হয়েছিল তাঁরা তা সমাজের ব্যাপক জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সমাজে বিদ্যমান অনৈসলামিক আর্দশ, চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধ এবং ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আদর্শিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রামে লিপ্ত না হলে ইসলামের উপর সমাজের আস্থা কখনোই অর্জন করা যাবে না। প্রচলিত আদর্শ, প্রথা ও ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে বিদ্যমান ভ্রান্তি, অসততা, দূর্নীতি ও জুলুমকে সমাজের ব্যাপক জনসাধারণের সামনে প্রকাশ করে তার বিপরীতে ইসলামের সত্য ও ন্যায়ের বানীকে উপস্থাপন করার মাধ্যমে এই আদর্শিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

একটা সৎ ইসলামিক আন্দোলনকে অবশ্যই বিদ্যমান আদর্শ, ধারণা, মূল্যবোধ, প্রথা, আইন-কানুন, নিয়ম-পদ্ধতি যা কিছুই ইসলামের সাথে সংঘাতপূর্ণ সেগুলোর বিরুদ্ধে আদর্শিক লড়াই ঘোষণা করতে হবে। যে আন্দোলন রাসূল (সাঃ) এর পদ্ধতি অনুসরণ

করতে চায় তাকে অবশ্যই আমাদের বর্তমান সমাজে প্রচলিত পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদিসহ আরো যা কুফর-জাহেল মতবাদ ও চিন্তা-চেতনা আছে সেগুলোর ভ্রান্তি, দূর্নীতি ও জুলুমের প্রমাণ জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। অনৈসলামিক আচার-অনুষ্ঠান, চর্চা, মূল্যবোধ, ব্যবস্থা এবং আইন-কানুন সমূহকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে। সমাজকে এমন ভাবে সচেতন করতে হবে যেন সমাজের লোকজন এসব অনৈসলামিক বিষয় সমূহ সহজেই চিনতে পারে এবং পরিত্যাগ করে। রাজা-বাদশাহ, সমাজপতি, নেতা এবং বিভিন্ন ব্যক্তি যারা ইসলামের বিপরীতে কাজ করে সমাজের কাছে তাদের এই কাজের পেছনের মূল কারণগুলো উন্মোচন করতে হবে। ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের প্রতারণা, পরিকল্পনা, নৃশংসতা, ষড়যন্ত্র এবং নীতিসমূহ জাতিকে জানাতে হবে। রাসূল (সাঃ) আল্লাহ্'র কাছ থেকে নির্দেশনা প্রাপ্ত হয়ে কখন কিভাবে এসব কাজ করতে হবে তার উদাহরণ আমাদের জন্য রেখে গেছেন। যারা কোনও সমালোচনা, ভয় বা সংকোচের বশবর্তী হয়ে বা অন্য কোনও কারণে এই গুরুদায়িত্ব পালন থেকে বিরত হবে তারা রাসূল (সাঃ) এর পদ্ধতিকে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হবে।

আপোসের প্রস্তাব

যখন কুরাইশরা বিভিন্ন সমালোচনা ও যুক্তিতর্কের মাধ্যমে রাসূল (সাঃ) কে দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত রাখতে ব্যর্থ হল তখন তারা বিভিন্ন দরকষাকষি, সমঝোতা ও আপোসের প্রস্তাব নিয়ে এল। কুরাইশ নেতারা রাসূল (সাঃ) এর কাছে সম্পদ, নেতৃত্ব ও রাজত্ব দানের প্রস্তাব দিয়ে কয়েকজন প্রতিনিধি প্রেরণ করল। তিনি (সাঃ) তাঁর উপর নাযিলকৃত বাণীর সাথে কোনও রূপ আপোসের নীতি গ্রহণ না করে সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। যন্ত্রনাভোগ ও সাফল্য প্রত্যাশার এক পর্যায়ে বিশ্বাসীরা এমন একটা অবস্থানে এসে উপনীত হবে যেখানে তাদেরকে আপোসের প্রস্তাব দেয়া হবে। রাসূল (সাঃ) এর সীরাত থেকে আমরা দেখতে পাই যে, দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে কোনও আপোস কিংবা অর্ধ সমাধানের পথ নেই। ইসলাম কখনোই জাহেলিয়াতের সাথে সংঘর্ষহীনভাবে সহাবস্থান করতে পারে না, ইসলাম কখনো এমন অবস্থা মেনে নিতে পারে না যেখানে অর্ধেক ইসলাম আর অর্ধেক জাহেলিয়াত। হয় আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা)'র শরিয়াহ্ পরিপূর্ণভাবে বিজয়ী হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে অথবা মানব মস্তিষ্ক প্রসূত জালিম জীবন ব্যবস্থার বিপরীতে ইসলামের সংগ্রাম চলতে থাকবে।

আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা) বলেন,

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

"আর আমি আদেশ দিতেছি যে, আপনি ইহাদের পারস্পরিক ব্যাপারে এই প্রেরিত কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করিবেন এবং তাহাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করিবেন না এবং তাহাদিগ হইতে অর্থাৎ এই বিষয়ে সতর্ক থাকিবেন যেন তাহারা আপনাকে আল্লাহ্'র প্রেরিত কোনও নির্দেশ হইতে বিভ্রান্ত করিতে না পারে।" [সূরা আল-মায়িদা: ৪৯]

এভাবে কোনও অনৈসলামিক শাসন ব্যবস্থার সাথে যোগ দিয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে (যেমন বিচার ব্যবস্থা) ইসলাম প্রয়োগের বিনিময়ে বাকি সমস্ত কুফর ব্যবস্থাকে সমর্থন জানানো বা মেনে নেওয়া রাসূল (সাঃ) এর পদ্ধতি হতে পারে না। ক্রমান্বয়ে ইসলাম প্রয়োগ করার মানে হচ্ছে সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ ঘটানো যা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। আপোসের মাধ্যমে মূল লক্ষ্য থেকে যে কোনও রূপ বিচ্যুতি রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ্ বিরোধী। আমাদের ক্ষেত্রে সেই মূল লক্ষ্যটা হচ্ছে পৃথিবীতে মুসলমানদেরকে নেতৃত্বদানকারী খিলাফত রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। এই লক্ষ্যের সাথে কোনও আপোস হতে পারে না।

রাসূল (সাঃ) বনু আমির গোত্রের সাহায্য নিতে অস্বীকার করেছিলেন, কেননা তারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পর মুসলমানদের নেতৃত্বকে তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়ার শর্ত আরোপ করেছিল। রাসূল (সাঃ) সেবান বিন তালাবা গোত্রের সাহায্যও গ্রহণ করেননি, কেননা তারা আরবের সব গোত্রের বিরুদ্ধে তাঁকে প্রতিরক্ষা দেওয়ার অঙ্গীকার করলেও পারসিকদের বিরুদ্ধে তাঁর (সাঃ) নিরাপত্তা দিতে অপারগতা প্রকাশ করেছিল।

শুধু ক্ষমতার জন্য ক্ষমতায় আসা ইসলামের উদ্দেশ্য নয়। আমাদেরকে যদি ইসলামিক লক্ষ্য ও পদ্ধতি থেকে বিচ্যুত হতে হয় তবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার কোনও অর্থই থাকে না।

যদিও এই আন্দোলনের উদ্দেশ্যে হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহ্'র আইন ও ইসলামিক জীবন ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা কিন্তু সেই সাথে এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের প্রত্যেকটা কাজের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি অর্জন করা। তাই প্রত্যেকটা কাজ, হোক সেটা ব্যক্তিগত কিংবা দলীয়, কারো প্রশংসা প্রত্যাশা না করে শুধুমাত্র আল্লাহ্'র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ প্রদত্ত পদ্ধতি অনুযায়ী হারাম-হালালের সীমার মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। দল, নেতৃত্ব এবং সদস্যদের আন্তরিকতা ও সততা তাদের প্রত্যেকটা কাজে প্রতিফলিত হতে হবে। সৎপথের উপর দৃঢ় থাকাটাই সাফল্যের পথকে সহজতর করবে, কেননা সাফল্য আসে শুধুমাত্র আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা)'র কাছ থেকেই।

ইসলাম বিরোধীদের জুলুম ও নির্যাতন

রাসূল (সাঃ) এর সীরাতে আমরা দেখতে পাই যখন কুরাইশদের আপোস প্রস্তাব ও দরকষাকষির কৌশল ব্যর্থ হল তখন তারা প্রত্যক্ষ হিংসাত্মক কার্যকলাপের পথ অবলম্বন করা শুরু করল। তারা মুসলমানদেরকে নির্যাতন করার নীতি গ্রহণ করল। প্রথমে তারা লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছিল সেসব মুসলমানদেরকেই সমাজে যাদের তেমন কোনও দৃঢ় অবস্থান ছিলনা। এসব মুসলমানকে তারা বন্দী করল, অত্যাচার চালাল এবং অনেককে হত্যাও করল। তারা রাসূল (সাঃ) এর প্রতিও তাদের আক্রমণ পরিচালিত করেছিল; তারা তাঁকে (সাঃ) নানারকম অপবাদ দিল, তার বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করল এবং তাঁকে (সাঃ) শারীরিকভাবে আঘাত করতে শুরু করল। এই নির্যাতন দেখে রাসূল (সাঃ) এক পর্যায়ে তাঁর অনুসারীদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার অনুমতি দেন।

যখন কুরাইশরা দেখল রাসূল (সাঃ) এর সাহাবা (রাঃ) গণ আবিসিনিয়ায় হিজরত করছেন, হযরত উমর (রাঃ) ও হামযা (রাঃ) এর মত নেতৃস্থানীয় মানুষেরা ইসলাম গ্রহণ করে ফেলছে ও ইসলামের বাণী দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে তখন তারা ইসলামের অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করার জন্য নিজেদের মধ্যে একটা চুক্তি সম্পাদন করল। এতে তারা নিজেদের জন্য মুসলমানদের বিশেষত বনু হাশিম গোত্রের বনু আব্দুল মুত্তালিব পরিবারের ব্যাপারে কিছু শর্ত নির্ধারণ করল। যেমন, তাদের সাথে কেউ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে না, তাদের সাথে মেলামেশা করবে না ও তাদের সাথে কোনও রকম কেনাবেচা করবে না। এমতাবস্থায় মুসলমানরা বাধ্য হল মক্কার বাইরে অনুর্বর শেব-ই-আবু তালিব উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করতে। এভাবে তারা তীব্র বয়কটের শিকার হলেন। এই কঠিন অমানবিক বয়কট রাসূল (সাঃ) এর নবুয়্যতের সপ্তম থেকে দশম বৎসর পর্যন্ত চলেছিল। এসময় মুসলমানরা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বিরূপ আবহাওয়া, রোগ-শোক ইত্যাদি তীব্র কষ্টের শিকার হন। বয়কট শেষ হওয়ার কিছুদিন পরই মাত্র একমাস ব্যবধানে রাসূল (সাঃ) এর স্ত্রী খাদিজা (রাঃ) এবং তাঁর (সাঃ) আশ্রয়দানকারী চাচা আবু তালিব মৃত্যুবরণ করেন। এই অপূরণীয় ক্ষতির কারণে এই বছরটা রাসূলের (সাঃ) জীবনে শোকের বৎসর (আম আল-হজন) হিসাবে পরিচিত।

আদর্শিক সংগ্রামের একপর্যায়ে ইসলামি আন্দোলন ও এর কর্মীরা জাহেল চিন্তাভাবনা ও মূল্যবোধে আচ্ছন্ন সমাজপতিদের ক্রোধের শিকার হতে বাধ্য। তখন তারা ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের উপর চাপিয়ে দেবে হত্যা, শারীরিক আঘাত, জেল, বহিষ্কারসহ নানা ধরনের নির্যাতন। এই আন্দোলন ও তার কর্মীদের বিরুদ্ধে চলবে নানা ধরনের প্রচার-প্রপাগান্ডা ও কুৎসা রটনার ষড়যন্ত্র। এটা অবশ্যম্ভাবী কিন্তু এটা যেন আল্লাহ্'র পথের পথিকদেরকে সত্যের পথে চলা থেকে বিরত করতে কিংবা তাদেরকে আদর্শচ্যুত করতে না পারে।

ত্যাগ স্বীকার

খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে ইসলামের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজন সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার; এর জন্য প্রয়োজন ধৈর্য্য ও কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা। সম্পদ, পরিবার ও প্রাণের মূল্যে পাড়ি দিতে হবে এই দুর্গম পথ। বিশ্বাসীদেরকে অবশ্যই এই সংগ্রামের পথে বিভিন্ন প্রলোভন থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। বিশ্বাসীরা এই পথ অতিক্রমের সময় নিদারুণ যন্ত্রণায় পতিত হবে আর এর মাধ্যমেই আমাদের প্রভূ আমাদের ভেতর থেকে ভালকে মন্দের কাছ থেকে পৃথক করে নেন। সৃষ্টিজগতে এটাই আল্লাহ্'র নিয়ম। আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা) বলেন:

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ*
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

"ঐ সকল লোকেরা কি ইহা ধারণা করিয়াছে যে, এই কথা বলিয়াই অব্যাহতি পাইবে যে, আমরা ঈমান আনিয়াছি, আর তাহাদিগকে পরীক্ষা করা হইবে না? আর আমি উহাদিগকেও পরীক্ষা করিয়াছিলাম যাহারা তাহাদের পূর্বে অতীত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আল্লাহ্ সেই

লোকদিগকে জানিয়া লইবেন যাহারা সত্যবাদী ছিল এবং মিথ্যাবাদীদিগকেও জানিয়া লইবেন।" [সূরা আনকাবুত: ২-৩]

নবী, রাসূল ও তাদেরকে যারা অনুসরণ করেছেন তারা সবাই দুঃখ, কষ্ট ও সীমাহীন কাঠিন্য দ্বারা তীব্রভাবে পরীক্ষিত হয়েছেন। তারা যে অবস্থার মুখোমুখি হয়েছেন আল্লাহ্ তা কুর'আনে এভাবে বর্ণনা করেছেন:

أَم حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

"তোমরা কি মনে কর যে, (বিনা শ্রমে) জান্নাতে প্রবেশ করিবে? অথচ তোমাদের ক্ষেত্রে এমন কিছু ঘটে নাই যাহা তোমাদের পূর্ববর্তীদিগের ক্ষেত্রে ঘটিয়াছে; তাহাদের উপর এমন এমন অভাব ও বিপদ-আপদ আসিয়াছিল এবং তাহারা এমন প্রকম্পিত হইয়াছিল যে, স্বয়ং রাসূল ও তাঁহার মুমিন সাথীগণও বলিয়া উঠিয়াছিলেন, আল্লাহ্'র সাহায্য কখন আসিবে? স্মরণ রাখিও নিশ্চয়ই আল্লাহ্'র সাহায্য নিকটেই।" [সূরা বাকারা: ২১৪]

অতঃপর, যারা ইসলামের বাণী বহন করবে দুঃখ, কষ্ট, হতাশা, দারিদ্র, সীমাহীন কঠিন পরিস্থিতি ইত্যাদি তাদেরকে ঘিরে রাখবে এটাই স্বাভাবিক। অত্যাচারী স্বৈরশাসকদের প্রতারণা, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি যেন কিছুতেই বিশ্বাসীদেরকে এই পবিত্র কাজ থেকে বিরত না রাখে এবং তাদের প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞাকে দুর্বল না করে। আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা) আমাদেরকে জানাচ্ছেন যে, একটা চরম অসহায় অবস্থায় উপনীত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি তার রাসূলদের প্রতিও সাহায্য আর বিজয় পাঠাননি।

আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা) বলেন,

حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا

"অবশেষে যখন পয়গম্বরগণ নিরাশ হইয়া পড়িলেন এবং তাহাদের ধারণা জন্মিল যে, আমাদের বুঝের ভুল হইয়াছে, তখনই তাহাদের নিকট আমার সাহায্য আসিয়া পৌঁছিল।" [সূরা ইউসুফ: ১১০]

আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা)'র নিয়মই হচ্ছে যে দুঃখ, কষ্ট, সংকট, ও বিভিন্ন কঠিন পরিস্থিতি অতিক্রম করার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ্'র তরফ থেকে স্বস্তি ও বিজয় আসে না। সুতরাং বিশ্বাসীদেরকে অবশ্যই ধৈর্য্য ও সহনশীল হতে হবে এবং উপলব্ধি করতে হবে যে আমদের জীবন, সম্পদ, পরিবার এবং যা কিছু আমাদেরকে আনন্দ দেয় তার চাইতে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা)'র আহ্বানে সাড়া দেয়া আমাদের কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা) বলেন,

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

"যদি তোমাদের পিতৃবর্গ এবং তোমাদের পুত্রগণ এবং তোমাদের ভ্রাতাগণ এবং তোমাদের স্ত্রীগণ এবং তোমাদের স্বগোত্র আর সেই সকল ধন-সম্পদ যাহা তোমরা অর্জন করিয়াছ এবং সেই ব্যবসায় যাহাতে তোমরা মন্দা পড়িবার আশঙ্কা করিতেছ, আর সেই গৃহসমূহ যাহা তোমরা পছন্দ করিতেছ, (যদি এই সব) তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের চেয়ে এবং তাঁহার রাস্তায় সংগ্রাম করার চেয়ে, তবে তোমরা প্রতীক্ষা করিতে থাক এই পর্যন্ত যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজের নির্দেশ পাঠাইয়া দেন; আর আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা) পাপাচারীদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।" [সূরা তওবা: ২৪]

নেতৃস্থানীয়দের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা পর্ব

শোকের বৎসরের পর রাসূল (সাঃ) মক্কার বাইরের বিভিন্ন গোত্রের কাছে নিজেকে উপস্থাপন করতে শুরু করলেন। যখনই কোনও সুযোগ আসত, বিশেষ করে হজ্জের মৌসুমে যখন মক্কায় বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা হজ্জ সম্পাদন করতে আসত, তিনি (সাঃ) নিজেকে তাদের কাছে উপস্থাপন করতেন। তিনি (সাঃ) তাদেরকে তাঁর (সাঃ) উপর বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য আহ্বান করতেন এবং তাঁকে (সাঃ) নিরাপত্তা দান করার অঙ্গীকার আদায়ের চেষ্টা করতেন।

রাসূল (সাঃ) ছাকিফ, কিন্দা, বনু আমির বিন সা'সা, বনু কালব এবং বনু হানিফসহ অনেক গোত্রের কাছেই নিজেকে উপস্থাপন করেছিলেন। বনু আমির গোত্র বলল,"আমরা যদি প্রকৃতপক্ষেই আপনার আনুগত্য করি এবং আল্লাহ্ আপনাকে আপনার শত্রুদের উপর বিজয়ী করেন, তখন কি আমরা আপনার পরে ক্ষমতার অধিকারী হতে পারব? রাসূল (সাঃ) উত্তর করলেন,

أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ، ثم أظهرك الله على من خالفك ، أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ قال : الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء

"ক্ষমতা তো আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন।"

এই গোত্রগুলোর কোনোটাই ইতিবাচক সাড়া দেয়নি। যাই হোক, রাসূল (সাঃ) নিজেকে বিভিন্ন গোত্রের কাছে পেশ করার কাজ চালিয়ে যেতে থাকলেন। এরই এক পর্যায়ে আল-আকাবাতে মদীনার খাযরাজ গোত্রের কতিপয় লোকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তারা তাঁর (সাঃ) আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তারা মদীনায় ফিরে গিয়ে নিজেদের

গোত্রের লোকদের কাছে আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে বললেন এবং তাঁর (সাঃ) উপর ঈমান আনার জন্য আহ্বান জানালেন।

পরের বৎসর হজ্জের মৌসুমে আল-আকাবাতে ১২ জন আনসার (সাহায্যকারী) রাসূল (সাঃ) এর কাছে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলেন। এরপর তাঁরা (রাঃ) রাসূল (সাঃ) এর সাহাবী মুসাব বিন উমায়ের (রাঃ) সহ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। রাসূল (সাঃ) মুসাব বিন উমায়ের (রাঃ) কে মদীনার লোকদের ইসলাম শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। রাসূল (সাঃ) এর হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত মুসাব বিন উমায়ের (রাঃ) মদীনায় ইসলাম প্রচার করতে লাগলেন এবং কিছু দিনের মধ্যেই মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের বানী পৌঁছে গেল।

পরের বছর মুসাব (রাঃ) এবং ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা রাসূলের (সাঃ) সাথে সাক্ষাৎ এবং তাঁকে (সাঃ) আনুগত্য ও সমর্থন দানের অঙ্গীকার করার জন্য মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। তারা রাসূল (সাঃ) এর হাতে এই বলে শপথ করলেন যে, তারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এর আনুগত্য করবেন এবং নিজেদের জান-মাল ও সমস্ত শক্তি সামর্থ্য দ্বারা রাসূল (সাঃ) কে শত্রুর আক্রমণের মুখে রক্ষা করবেন। আল-আকাবার দ্বিতীয় শপথের (যা বা'য়াত আল হরব বা যুদ্ধের শপথ নামে পরিচিত) পর রাসূল (সাঃ) তাঁর অনুসারীদেরকে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। কিছুদিন পরই আল্লাহ্'র অনুমতি লাভের পর রাসূল (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ) সহ মদীনায় হিজরত করলেন এবং তখনই প্রতিষ্ঠিত হল প্রথম ইসলামিক রাষ্ট্র।

জনমতের গুরুত্ব

প্রকাশ্য সামাজিক পর্যায়ে জনগণ যে বিষয়টাকে সম্মান বা অসম্মান করে তার ভিত্তিতেই একটা জাতি পরিচালিত হয়। ব্যক্তিগত মতামতের ভূমিকা এক্ষেত্রে অত্যন্ত গৌণ। মানুষের সংগঠিত মতামত বা কাজ যা সামাজিক সিদ্ধান্তকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে করা হয় কেবল তার দ্বারাই জনমত প্রভাবিত হয়। আলাদা আলাদা ভাবে ব্যক্তিরা কী মনে করে বা বিশ্বাস করে তার দ্বারা সমাজ পরিচালিত হয় না। সমাজের সম্মিলিত নীতিবোধই সবসময় জনমত তৈরী করে ও ব্যক্তির মতামতকে প্রভাবিত করে। এর একটা উদাহরণ হচ্ছে কুরাইশদের দ্বারা বয়কট চুক্তির বিলোপ সাধন। আবু জেহেল ও কুরাইশ নেতারা একে পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় বললেও জনমতের চাপের কারণে কুরাইশরা এই বয়কটের সমাপ্তি টানতে বাধ্য হয়েছিল।

সমাজ পরিবর্তন করতে হলে সমাজের প্রত্যেককেই পরিবর্তন করতে হবে এমন কোনও আবশ্যকতা নেই। যা আবশ্যক তা হল সম্মিলিত মতামত বা জনমতের পরিবর্তন সাধন। তাই কুফর সমাজকে ইসলামিক সমাজে পরিণত হতে হলে সম্মিলিত চিন্তা ভাবনা ও জনমতগুলোকে অবশ্যই ইসলামিক হতে হবে। মুসাব (রাঃ) যখন মদীনা থেকে প্রত্যাবর্তন করে রাসূল (সাঃ) কে তাঁর কাজের ফলাফল সম্পর্কে বিবরণ দিচ্ছিলেন তখন তিনি (রাঃ) জানালেন যে ইসলাম মদীনার ঘরে ঘরে প্রবেশ করেছে, তার মানে এই নয় যে সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছে, বরং তার মানে হচ্ছে ইসলাম জনগণের সম্মিলিত মতামতের উপর

প্রাধান্য বিস্তার করেছে। এই ভিত্তির উপরই রাসূল (সাঃ) মদীনায় প্রথম ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

ব্যাপক গণমানুষের সাথে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা

ধারাবাহিক ও ব্যাপকভিত্তিক বিতর্ক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার মাধ্যমেই কেবল জনগণের সম্মিলিত মত তথা জনমত তৈরী করা যায়। যারা সমাজ পরিবর্তন করতে চায় তাদেরকে অবশ্যই সমাজের জনসাধারণের সাথে মিশতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় জনবিচ্ছিন্নতার কোনও স্থান নেই। একটা দীর্ঘ ও কষ্টকর বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের ভেতর দিয়ে সমাজকে অবশ্যই ইসলামিক মতামতে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। তাই এই আন্দোলনের কর্মীরা সব ক্ষেত্রে উম্মাহ্'র স্বার্থকে সংরক্ষণ করবে, জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তাদের সাথী হবে এবং উম্মাহ্কে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া অন্যায়, অত্যাচার ও জুলুম পরিত্যাগ করার জন্য উৎসাহিত করবে। উম্মাহ্'র উপর চাপিয়ে দেয়া সবচেয়ে বড় জুলুম হচ্ছে এই কুফর জীবনব্যবস্থা ও আইন-কানুন যা উম্মাহ্'র বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও আদর্শের বিপরীত। উম্মাহ্কে অবশ্যই দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করতে হবে যে একমাত্র ইসলামই তাদের রক্ষক এবং তারা তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া ধর্মনিরপেক্ষ কুফর জীবন ব্যবস্থার বদলে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা দ্বারা শাসিত হতে চায়। অনেকেই মনে করেন কেবলমাত্র একটা ইসলামিক সংবিধান প্রয়োগ করেই সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এটা একটা অবাস্তব ধারণা এবং এটা রাসূল (সাঃ) এর সমাজ পরিবর্তনের পদ্ধতির সাথে বৈপরীত্য পোষণ করে। সমাজে শরিয়াহ্ আইন সরাসরি প্রয়োগ করার পূর্বে অবশ্যই সমাজকে ইসলাম ধারণ করার উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। রাসূল (সাঃ) ইসলামিক মতবাদকে সমাজের আবেগ অনুভূতির ভিত্তি হিসাবে তৈরী করার জন্য সমাজের সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা ও বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তিনি (সাঃ) এটা করেছিলেন যেন জনগণ আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা) যা পছন্দ করেন শুধু তাই পছন্দ করে এবং আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা) যা অপছন্দ করেন তা তারাও অপছন্দ করে। তিনি (সাঃ) সমাজে সবচেয়ে প্রাধান্য বিস্তারকারী মতামত হিসাবে ইসলামিক মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন যেন মানুষের প্রত্যেকটা কাজ, স্বার্থ ও সম্পর্ক বিচারের মানদন্ড হয় হালাল-হারাম তথা আল্লাহ্ ও পরকালের চিন্তা। মদীনায় যখন এ ধরণের একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তখনই সেখানে প্রথম ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পাই মদীনায় ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে স্থানীয় অধিবাসীদের প্রায় সবাই একে স্বাগত জানিয়েছিল।

খিলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা খুব দূরে নয়

বিশ্বাসীদের উচিত আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা)'র উপর দৃঢ় আস্থা রাখা ও আশাবাদী হওয়া। তাদেরকে এটা বিশ্বাস করতে হবে যে আল্লাহ্'র সাহায্য খুব নিকটে এবং ইসলামিক রাষ্ট্র (খিলাফত) অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে। রাসূল (সাঃ) খিলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আমাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। এ ব্যাপারে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, *"রাসূল (সাঃ) বলেছেন,*

تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة

'তোমাদের মধ্যে নবুয়্যত থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, তারপর তিনি তার সমাপ্তি ঘটাবেন। তারপর প্রতিষ্ঠিত হবে নবুয়্যতের আদলে খিলাফত। তা তোমাদের মধ্যে থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করবেন অতঃপর তিনি তারও সমাপ্তি ঘটাবেন। তারপর আসবে যন্ত্রণাদায়ক বংশের শাসন তা থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। এক সময় আল্লাহ্'র ইচ্ছায় এরও শেষ হবে। তারপর প্রতিষ্ঠিত হবে জুলুমের রাজত্ব এবং তা তোমাদের উপর থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করবেন। তারপর তিনি তা অপসারণ করবেন। তারপর আবার ফিরে আসবে খিলাফত– নবুয়্যতের আদলে।' এরপর তিনি (সাঃ) নীরব থাকলেন।"

এই হাদীস রাসূল (সাঃ) এর নবুয়্যতের একটা প্রমাণ কারণ এটা অদৃশ্য সম্পর্কে বর্ণনা করে। এতে নবুয়্যত, ভবিষ্যৎ খিলাফত, যন্ত্রণাদায়ক বংশের শাসন ও অত্যাচারী রাজতন্ত্র সম্পর্কে বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে এবং বাস্তবক্ষেত্রে এগুলোর অধিকাংশ ঘটেও গেছে। এই হাদীসে বর্ণিত ভবিষ্যৎ বাণী যা এখনো সংঘটিত হতে বাকি তা হচ্ছে এর শেষাংশের বর্ণনা– খিলাফত, যা নবুয়্যতের আদলে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। অন্য একটা হাদীসে খিলাফতের সীমানার প্রসার ও এর অনেক বিজয়ের তথ্য দেওয়া হয়েছে।

আবু কুবাইল এর উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম আহমদ ও ইমাম আদ দার্‌মি বর্ণনা করেন,

وعن أبي قبيل قال: كنا عند عبدالله بن عمرو بن العاص، وسئل أي المدينتين تفتح أولاً القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبدالله بصندوق له خلق، قال: فأخرج منه كتاباً. قال: فقال عبدالله: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولاً أقسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [مدينة هرقل تفتح أولاً]. يعني قسطنطينية (رواه أحمد والدارمي وغيرهما وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة).

"আমরা আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন আল আ'স এর সাথে ছিলাম এবং তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল– কনস্টানটিনোপল ও রোম এই দুইটি নগরীর মধ্যে কোনটা প্রথমে বিজিত হবে? আব্দুল্লাহ্ তখন আংটি ভর্তি একটি বাক্স আনালেন, তিনি তার ভেতর থেকে একটা বই বের করলেন, আব্দুল্লাহ্ বললেন, রাসূল (সাঃ) কিছু লেখার কাজ করছিলেন এবং আমরা তার পাশে বসেছিলাম এবং তখন রাসূল (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কোন নগরী প্রথম বিজিত হবে– কনস্টানটিনোপল না রোম? রাসূল (সাঃ) বললেন, 'হীরাকলের নগরী (কনস্টানটিনোপল) প্রথমে বিজিত হবে।' "

উপরোক্ত হাদীস নির্দেশ করে মুসলমানরা একসময় ইটালির রাজধানী, খৃষ্টানিটির ঘাঁটি, পোপের শহর রোম জয় করবে। যা পূর্বের খিলাফতের সময় সম্ভব হয়নি, তখন কেবলমাত্র কনস্টানটিনোপল (ইস্তাম্বুল) জয় করা হয়েছিল।

আল্লাহ্'র সাহায্য

আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা) বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ و يُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

"হে বিশ্বাসীগণ, যদি তোমরা আল্লাহ্কে সাহায্য কর আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করিবেন এবং পৃথিবীতে তোমাদেরকে দৃঢ় পদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।" [সূরা মুহাম্মদ: ৭]

যারা আল্লাহ্'র দ্বীনকে সাহায্য করবে তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা) তাদেরকে বিজয় দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা) বলেন,

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُه

"নিশ্চয় যারা আল্লাহ্কে সাহায্য করে আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করেন।"
[সূরা হজ্জ: ৪০]

এবং এই সাহায্য প্রদানকে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা) তাঁর নিজের জন্য ওয়াজিব করে নিয়েছেন। আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা) বলেছেন,

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

"বিশ্বাসীদেরকে সাহায্য করার জন্য আমি দায়িত্বশীল।" [সূরা রূম: ৪৭]

এই বিজয় কখন আসবে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা) যদি এই বিজয় দিতে ইচ্ছে করেন তবে বিশ্বাসীদের জানা এবং জানার বাইরের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিকে সেই বিজয়ের জন্য সহজ করে দেন। এটা আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে যে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা) ও তাঁর দ্বীনকে আমরা যত জোরালোভাবে সাহায্য করতে পারব তাঁর প্রতিশ্রুতি মত এই সাহায্য ততই আমাদের নিকটবর্তী হবে। এজন্য আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা)'র পক্ষ থেকে পুরষ্কার ও বিজয় পেতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে হবে; শুধুমাত্র তাঁরই ইচ্ছার কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করতে হবে; আমাদেরকে সংশায়াতীতভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, শুধুমাত্র তিনিই সৃষ্টিকর্তা, দাতা, তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, কাউকে সম্মানিত কিংবা লাঞ্ছিত করেন এবং একমাত্র তিনিই বিজয় দেন; তিনি সবকিছুই করতে সক্ষম এবং আমাদের কেউই তার জন্য নির্ধারিত রিযিক পরিপূর্ণভাবে প্রাপ্তির আগ পর্যন্ত

মৃত্যুবরণ করবে না এবং প্রত্যেকেই তার জন্য নির্ধারিত জীবনকাল ও ভাগ্যকে সম্পূর্ণ করবে।

হে বিশ্বাসীগণ, আল্লাহ্'র আহ্বানে সাড়া দিন

সাহাবা (রাঃ) গণ, আল্লাহ্ ও রাসূল (সাঃ) এর আহ্বানে সাড়া দেওয়ার কারণে তাঁর (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা)'র অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। তাঁরা (রাঃ) আল্লাহ্'র বাণীকে মর্যাদার আসনে সমাসীন করার জন্য নিজেদের জীবন ও সম্পদকে ব্যয় করে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা)'র কাছে তাদের (রাঃ) আন্তরিক ইচ্ছার প্রমাণ দিয়েছিলেন। তারা রাসূল (সাঃ) এর সাথে শির্কের রাজপ্রাসাদে জাহেলিয়াতের ধ্বংস স্তুপের উপর ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আজ উম্মাহ্'র মধ্যে ইসলামিক জীবন ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য বিশ্বাসীদের ঠিক সাহাবাদের (রাঃ) মত করে আল্লাহ্'র আহ্বানে সাড়া দিতে হবে। এজন্য মুসলমানদের এ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা প্রয়োজন। মুসলমানদের জানা উচিত যে এটা আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে তাদের উপর অর্পিত ফরজ দায়িত্ব এবং একে অবহেলা করা তাঁর (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা) কাছে কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। পৃথিবীতে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা তথা খিলাফত প্রতিষ্ঠার কাজে অন্যান্য ইবাদতের মতই আমাদেরকে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা)'র কিতাব ও রাসূল (সাঃ) এর সুন্নাহ্কে অনুসরণ করতে হবে।

রাসূল (সাঃ) এর সীরাত থেকে যে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় তা থেকে এটা বোঝা অত্যন্ত সহজ যে খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হলে আমাদেরকে প্রথমে ইসলামী চিন্তা ও আবেগকে উম্মাহ্'র মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। একজন দায়িত্বশীল ঈমানদার মানুষকে তার নিজের কর্তব্যবোধ থেকেই জনগণের মধ্যে ইসলামী আলোচনাকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে করে উম্মাহ্ ইসলামের উপর আস্থা ফিরে পায়; এত বেশী আলোচনার জন্ম দিতে হবে যাতে করে জনগণ ইসলাম ছাড়া আর কোনও বিকল্প ব্যবস্থা দেখতে না পায়। অফিসে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে, হোটেল-রেঁস্তোরায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে, মসজিদে, রাস্তায় ইত্যাদি সব জায়গায় তাদের সাথে মিশে আলোচনার মাধ্যমে তাদের মধ্যে ইসলামে বিশ্বাস ও আল্লাহ্'র উপর নির্ভরতার বীজ এমনভাবে বপন করতে হবে যেন তারা স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সকল ভয়-ভীতি ও জড়তা ত্যাগ করে রুখে দাঁড়ায় এবং অনৈসলামিক শাসন ব্যবস্থাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার মাধ্যমে তৈরী শক্তিশালী জনমতই উম্মাহ্কে তার গায়ে স্বৈরশাসকদের পরিয়ে দেওয়া ভয়ের চাদর ছিঁড়ে ফেলার দিকে পরিচালিত করবে। আর তখনই এই বিস্ফোরিত উম্মাহ্ অনৈসলামিক শাসনব্যবস্থাকে সরিয়ে আল্লাহ্'র দেওয়া ব্যবস্থাকে (খিলাফত) প্রতিষ্ঠিত করবে আর এই খিলাফতের নেতৃত্বেই সমস্ত মুসলিম উম্মাহ্ ঐক্যবদ্ধ হবে এবং পৃথিবীকে নেতৃত্বদানকারী জাতি হিসাবে নিজেদের অবস্থান পুনরায় ফিরে পাবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

“হে ঈমানদারগণ, যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এমন কোনও কিছুর দিকে তোমাদেরকে আহ্বান করেন যাহা তোমাদের মধ্যে জীবনের সঞ্চার করে তখন সেই আহ্বানে সাড়া দাও।” [সূরা আনফাল: ২৪]